Golam Mostafa's 'Bishwanabi' in Bengali Literature: A Review

Dr. Mahbubur Rahman [*]

ARTICLE INFORMATION

Journal of Dr. Serajul Haque Islamic Research Centre
Issue-29, Vol.-13, June 2024
ISSN:1997 – 857X (Print)
DOI:

Received: 7 March 2024
Received in revised form: 20 June 2024
Accepted: 26 June 2024

ABSTRACT

Poet Golam Mustofa's contribution to the literary history of Bengali Muslims is unforgettable. In contemporary times, his presence was essential in the fields of literature and culture. Golam Mustofa is called the poet of Islamic Renaissance and Muslim Awakening. Through poems, songs, ghazals, and various types of essays, he reminded Muslims of their glorious heritage. He also showed the way to the transition of the troubled Muslim nation. He was a true patriot, a pure Bengali, and a devout Muslim. Bishwanabi, written by poet Golam Mustofa, is an immortal creation and his best literary achievement. Among the books written on the Prophet's life in the Bengali language, Bishwanabi has gained the most popularity. Its expression and language are very vivid and dynamic. He was a skilled poet. His sincere devotional mood and poetic elegance balance the book beautifully. The sentiments of the devotional Bengali heart are echoed in his beautiful poetry.

ভূমিকা

গোলাম মোস্তফা ছিলেন ঊনবিংশ শতকের বাংলা সাহিত্যে ইসলামি ভাবধারার অন্যতম কবি। তিনি ছিলেন ইসলামি আদর্শে উজ্জীবিত। ইসলামি আদর্শ-ঐতিহ্য তার সাহিত্যকর্মের মূল উপজীব্য। ইসলামি চেতনার রূপায়ণই তার সাহিত্য সাধনার প্রধান উদ্দেশ্য এবং মুসলিম জাগরণ তার লক্ষ্য। কবির রচিত কবিতা, গান ও প্রবন্ধ সাহিত্যের অধিকাংশই মুসলিম জাগরণ ও ইসলামি ভাবধারা সম্পন্ন। তাঁর রচিত ইসলামি চেতনাকে জীবনী, শরী'আত ও সুফি বিষয়ে বিভাজন করা হয়েছে। বিশ্বের মুসলিম ও অমুসলিম পণ্ডিতগণ রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর জীবন চরিত বিষয়ক বহুসংখ্যক গ্রন্থ রচনা করে চলেছেন। যা কিয়ামত পর্যন্ত অব্যাহত থাকবে। এরই ধারাবাহিকতায় কবি ও সাহিত্যিক গোলাম মোস্তফা (১৮৯৭-১৯৬৪ খ্রি.) *'বিশ্বনবি'*

* অধ্যাপক, ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, রাজশাহী। mahbub.ru2011@gmail.com

নামে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর জীবন চরিত বিষয়ক গ্রন্থ রচনা করেছেন। এছাড়া *'বিশ্বনবি'*র বৈশিষ্ট্য, *'হযরত আবু বকর (রা.)'* শিরোনামে দু'টি গ্রন্থ রচনা করেন। আলোচ্য প্রবন্ধে গোলাম মোস্তফা রচিত *'বিশ্বনবি'* গ্রন্থটির পর্যালোচনা করার প্রয়াস চালানো হয়েছে।

গবেষণার উদ্দেশ্য

গোলাম মোস্তফা ও তাঁর রচিত *'বিশ্বনবি'* প্রবন্ধটি গবেষণার উদ্দেশ্য নিম্নরূপ-

ক. কবি গোলাম মোস্তফার সংক্ষিপ্ত পরিচিতি ও তাঁর রচনাবলি সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করার উদ্দেশ্যে প্রবন্ধটি রচিত হয়েছে।

খ. *'বিশ্বনবি'* গ্রন্থটির আলোচিত বিষয়বস্তু সম্পর্কে পাঠকমহল অতি অল্প সময়ে ব্যাপক ধারণা পাওয়াই প্রবন্ধটির উদ্দেশ্যে।

গ. প্রবন্ধটি পাঠের মাধ্যমে *'বিশ্বনবি'* গ্রন্থটিতে রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর বর্ণিত জীবন চরিত কতটুকু সহজে অনুধাবন করা যায়।

ঘ. মূলত *'বিশ্বনবি'* গ্রন্থটি পর্যালোচনার উদ্দেশ্যেই প্রবন্ধটি রচিত হয়েছে।

গবেষণা পদ্ধতি

প্রবন্ধটি (Qualititive) গুণগত রীতির (Analytical Method) বিশ্লেষণাত্মক পদ্ধতি অনুসরণে প্রণীত হয়েছে। প্রাথমিক উৎস হিসবে গোলাম মোস্তফা রচিত 'বিশ্বনিব', 'মোস্তফা সমগ্র', 'গোলাম মোস্তফা সংকলন' গ্রন্থসমূহকে মৌলিক গ্রন্থাবলি হিসেবে নির্ধারণ করা হয়েছে। গৌণ উৎস হিসেবে বিভিন্ন গবেষণা গ্রন্থ, প্রবন্ধ, সাময়িকী ও ইন্টারনেট থেকে তথ্য নেয়া হয়েছে। উদ্ধৃতি ও তথ্যসূত্র ব্যবহারের ক্ষেত্রে CS রীতি বা 'শিকাগো পদ্ধতি' এর অনুসরণ করা হয়েছে।

সাহিত্য পর্যালোচনা

গোলাম মোস্তফা ও তাঁর রচনাবলী সম্পর্কিত বেশ কয়েকটি গবেষণাকর্ম সম্পাদিত হয়েছে। ঢাকা, রাজশাহী ও ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে এ বিষয়ের উপর পাঁচটি গবেষণাকর্ম সম্পাদিত হয়। তা নিম্নরূপ-

১. বেগম আজিজুন নাহার, কবি গোলাম মোস্তফা ও তাঁর সাহিত্যে ইসলামি ভাবধারা, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, অপ্রকাশিত এম.ফিল অভিসন্দর্ভ, ১৯৯৫ খ্রি.।

২. মোঃ আব্দুছ ছবুর, কবি গোলাম মোস্তফার কবিতায় ইসলামি চেতনা, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, অপ্রকাশিত পিএইচ.ডি অভিসন্দর্ভ, ২০০৮ খ্রি.।

৩. গোলাম মোস্তফার সাহিত্যে আরবী শব্দের ব্যবহার ও প্রভাবঃ একটি পর্যালোচনা, ইসলামি বিশ্ববিদ্যালয়, কুষ্টিয়া, অপ্রকাশিত এম.ফিল অভিসন্দর্ভ ২০১১ খ্রি.।

৪. শাহ্নাজ পারভীন, কবি গোলাম মেস্তফার সাহিত্যকর্মে মুসলিম ঐতিহ্যের রূপায়ন, ইসলামি বিশ্ববিদ্যালয়, কুষ্টিয়া, অপ্রকাশিত পিএইচ.ডি অভিসন্দর্ভ, ২০১২ খ্রি.।

৫. মোঃ মোক্তার আলী, কবি গোলাম মোস্তফা রচনাবলীতে ইসলামি ভাবধারা, ইসলামি বিশ্ববিদ্যালয়, কুষ্টিয়া, অপ্রকাশিত এম.ফিল অভিসন্দর্ভ ২০১৬ খ্রি.।

উপর্যুক্ত গবেষণাকর্মগুলোতে কবি গোলাম মোস্তফার জীবন চরিত, ইসলামি সাহিত্যে তাঁর অবদান, কবির সাহিত্যকর্ম, কবিতা ও তাঁর সাহিত্যে আরবি শব্দের প্রয়োগ ইত্যাদি বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে। কিন্তু ভিন্নভাবে *'বিশ্বনবি'* গ্রন্থ সম্পর্কে পর্যালোচনামূলক বর্ণনা নেই বললেই চলে। তাই এ প্রবন্ধটি শুধুমাত্র গোলাম মোস্তফার *'বিশ্বনবি'* সম্পর্কিত আলোচনা স্থান পেয়েছে। যার মাধ্যমে পাঠক মহল *'বিশ্বনবি'* গ্রন্থটি সম্পর্কে বিস্তর ধারণা লাভ করতে সক্ষম হবে। যা দ্বারা বাংলা সাহিত্যে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর জীবন চরিত চর্চা ও *'বিশ্বনবি'* সম্পর্কে শিক্ষক, ছাত্র ও পাঠকমহল উপকৃত হতে পারবে বলে আমার বিশ্বাস।

ঊনবিংশ শতাব্দীতে বাংলাদেশের জাতীয় জাগরণে মাহেন্দ্রক্ষণে মুসলিম কবি সাহিত্যিক বাহন হিসেবে গ্রহণ করে উদ্বুদ্ধ হয়েছিলেন সামাজিক, ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে নব জাগরণ ও নব চেতনায়। মুসলিম ইতিহাস, সংস্কৃতি, সাধক জীবন, রাসূলের শিক্ষা ও আদর্শের প্রতি তারা বিশেষ মনোযোগী হলেন। দূর হেরার তোরণ তাদের প্রেরণা হলো বলে তারা কল্পনা করেছিলেন। আধুনিক কালের রাসূল চরিত সাহিত্যসমূহ সে ঐতিহ্যরসে লালিত। আমাদের সাহিত্যে এ জীবনী সাহিত্যের বিশেষ প্রভাব স্বীকার্য।[১]

সাহিত্য

সাহিত্য হলো মানব হৃদয়ের প্রাণ। মানব মনের ভাবাবেগ, অনুভূতি, আশা-আকাঙ্খা, চিন্তা-চেতনা এবং কল্পনার সুবিন্যাস্ত ও সুপরিকল্পিত রূপ। সাহিত্য শব্দ বা ভাষার আশ্রয়ে সৃষ্টি বাক্য, গল্প, কবিতা, উপন্যাস, নাটক, প্রবন্ধ, জীবন চরিত ইত্যাদির মধ্য দিয়ে প্রকাশিত হয়। কবি Mathew Arnold সাহিত্য বা কবিতার সংজ্ঞা দিতে গিয়ে অতি সংক্ষেপে বলেন, Poetry is the criticism of life 'কবিতা বা সাহিত্য হচ্ছে জীবনের বিশ্লেষণ বা সমালোচনা।' কারো কারো মতে, Literature is the exposition of what man feels and thinks 'মানব মনের চেতনা বা অনুভূতির বহিঃপ্রকাশই হচ্ছে সাহিত্য।'

সাহিত্য শিল্পের একটি অংশ বলে বিবেচিত হয়, অথবা এমন কোনো লেখনি, যেখানে শিল্পের বা বুদ্ধিমত্তার আঁচ পাওয়া যায়, অথবা যা বিশেষ কোনো প্রকারে সাধারণ লেখনি থেকে আলাদা। মোটকথা, ইন্দ্রিয় দ্বারা জাগতিক বা মহাজাগতিক চিন্তা-চেতনা, অনুভূতি, সৌন্দর্য ও শিল্পের লিখিত বা লেখকের বাস্তব জীবনের অনুভূতি হচ্ছে সাহিত্য।

বাংলা সাহিত্য

পৃথিবীতে এমন কোনো মানব জাতির অস্তিত্ব পাওয়া যাবে না যে জাতির সাহিত্য নেই। তেমনি আমাদেরও আছে সাহিত্য। আমরা বাঙালি। বাংলা আমাদের ভাষা। আমরা বাংলায় কথা বলি, বাংলায় লিখি। তাই আমাদের সাহিত্যের নাম 'বাংলা সাহিত্য'। বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের ইতিহাস হাজার বছরের ইতিহাস। ভাষা ও সাহিত্যের সাথে একটি বিরাট যোগসূত্র রয়েছে। সাহিত্য ভাষাকে পরিবর্তন করে বদলে দেয়। ভাষাকে সমৃদ্ধ করে। অন্য সব কিছুর মতো ভাষাও জন্ম নেয়। বিকশিত হয়, কালে কালে রূপ বদলায়। বাংলা ভাষায় রচিত সাহিত্যকর্ম 'বাংলা সাহিত্য' নামে পরিচিত।

বাংলা সাহিত্যের শুরু কবিতা, কাব্য, পুঁথি প্রভৃতি এবং পালি, প্রাকৃত ও রাঢ় ভাষা দিয়ে শব্দ ও বাক্যের প্রচলন রীতি। বহুকাল পরে বাংলা পদ্য ও গদ্য উভয় ক্ষেত্রেই যুক্ত হয়েছে সংস্কৃত, ইংরেজি, ফার্সি, আরবি, ল্যাটিন ইত্যাদি শব্দ বা শব্দমালা। আনুমানিক খ্রিস্টীয় সপ্তম শতাব্দীর মাঝামাঝি বাংলা ভাষায় সাহিত্য রচনার সূত্রপাত হয়। খ্রিস্টীয় দশম থেকে দ্বাদশ শতাব্দীর মধ্যবর্তী সময়ে রচিত বৌদ্ধ দোহা-সংকলন চর্যাপদ বাংলা সাহিত্যের প্রাচীনতম নিদর্শন।

গোলাম মোস্তফার সংক্ষিপ্ত পরিচিতি

গোলাম মোস্তফা বাংলা সাহিত্যে প্রথম পর্যায়ের ইসলামি ভাবধারার যে কজন কবি ও সাহিত্যিক রয়েছেন তাঁদের মধ্যে অন্যতম। তিনি একাধারে শিক্ষাবিদ, সাহিত্যিক ও আধুনিক কবি ছিলেন। বাঙালি মুসলিমগণের জাতীয় জাগরণের জন্য তিনি রচনা করেছেন বহুসংখ্যক কাব্য, উপন্যাস, প্রবন্ধ, সাহিত্য ও অনুবাদকর্ম। তাঁর এ সব রচনাবলীর অধিকাংশই ইসলামি চেতনায় সমৃদ্ধ।

জন্ম ও জন্মস্থান

কবি সাবেক যশোর, জেলার ঝিনাইদহ মহকুমা (বর্তমান জেলা) শৈলকুপা উপজেলার ১৩ নং ফাজিলপুর ইউনিয়ন, মনোহরপুর গ্রামে সম্ভ্রান্ত কাজী পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। স্কুল সার্টিফিকেট অনুযায়ী তাঁর জন্মসাল ও তারিখ ১৮৯৭ খ্রিস্টাব্দের ২২ ডিসেম্বর।[২] তবে প্রকৃত জন্মসাল হলো ১৮৯৫ খ্রিস্টাব্দ। তাঁর নিজের লেখা 'আমার জীবন স্মৃতিতে' লিখেছেন,

> 'আমার জন্ম পল্লী হলো ঝিনাইদহ মহকুমার শৈলকুপা থানার অন্তর্গত মনোহরপুর গ্রামে। আমার ম্যাট্রিকুলেশন সার্টিফিকেটের বর্ণনানুসারে দেখা যায় ১৮৯৭ খ্রিস্টাব্দে আমার জন্ম। কিন্তু আমার মনে আছে শৈলকুপা হাই স্কুলে ভর্তি হবার সময় আব্বা আমার বয়স প্রায় দুই বছর কমিয়ে দিয়েছিলেন। কাজেই প্রকৃত জন্ম হয়েছিল সম্ভবত ১৮৯৫ খ্রিস্টাব্দ। তবে এটা ঠিক যে, যেদিন আমার জন্ম হয় সেদিন বাংলা তারিখ ছিল ১৩০১ বঙ্গাব্দের ৭ পৌষ, রবিবার।'[৩]

শিক্ষা জীবন

গোলাম মোস্তফার শিক্ষা জীবনের সূচনা হয় চার বছর বয়সে নিজগৃহে পিতা গোলাম রব্বানীর নিকট। মনোহরপুর গ্রামের পার্শ্ববর্তী 'দামুকদিয়া' গ্রামের পাঠশালায় প্রথমে শিশু গোলাম মোস্তফা ভর্তি হন। এখানে কিছু দিন লেখাপড়ার পর তিনি নিকটবর্তী 'ফাজিলপুর' গ্রামের পাঠশালাতে ভর্তি হন। এ পাঠশালায় তিনি পণ্ডিত ত্রৈলক্ষ্যনাথ দত্তকে শিক্ষক হিসাবে পান এবং তাঁর কাছে শিক্ষা লাভ করেন।[৪]

শৈলকুপা হাই স্কুল থেকে তিনি **১৯১৪** খ্রিস্টাব্দে বিশেষ কৃতিত্বের সাথে প্রবেশিকা বা ম্যাট্রিকুলেশন পাশ করেন।[৫] খুলনার বি.এল কলেজ থেকে **১৯১৬** খ্রিস্টাব্দে আই.এ পাশ করেন।[৬] অতঃপর **১৯১৮** খ্রিস্টাব্দে কলিকাতার রিপন কলেজ থেকে বি.এ পাশ করেন।[৭] কবি আর্থিক অসচ্ছলতার কারণে বি.এ পাশ করার পর আর তাঁর লেখা-পড়া করা সম্ভব হয় নি। পরে ডেভিড হেয়ার ট্রেনিং কলেজ থেকে **১৯২২** খ্রিস্টাব্দে বি.টি ডিগ্রি লাভ করেন।[৮]

কর্মজীবন

কর্মজীবনে গোলাম মোস্তফা ছিলেন একজন শিক্ষক। তিনি তাঁর লেখনির মাধ্যমে চেষ্টা করেছিলেন শিক্ষা বিভাগের কারিকুলামে আমূল পরিবর্তন করতে। কোমলমতি শিক্ষার্থীদের উপযুক্ত পাঠ্যবই উপহার দিতে রচনা করেন, আলোক মঞ্জুরী, আলোক মালা, পথের আলো, নতুন আলো, ইসলামি নীতিকথা, ইতিহাস পরিচয়, মরু দুলাল, কাব্য কাহিনী, আনন্দের কথা প্রভৃতি। এ গ্রন্থগুলোর বেশির ভাগই সে সময়ে পাঠ্যক্রমের অন্তর্ভুক্ত ছিলো। শিক্ষকতা জীবনে আদর্শ শিক্ষক হবার গৌরব অর্জন করেন তিনি। তদানীন্তন অবিভক্ত বাংলার উল্লেখযোগ্য কয়েকটি বিদ্যালয়ে তিনি প্রধান শিক্ষকের পদও অলংকৃত করেন। শিশু সাহিত্য রচনার ক্ষেত্রে কবি ঈর্ষণীয় ভূমিকা রাখতে সক্ষম হন। শিশুদের উপযোগী করে এমন চমৎকার লেখা আর কেউ উপহার দিতে পারেন নি। কলিকাতার 'কিশোর' পত্রিকার সম্পাদক কবির লেখা 'কিশোর' কবিতাটি হাতে পেয়ে কবিকে লিখেছিলেন,

"আপনার কবিতার জন্য ধন্যবাদ। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কাব্যপরিধি মাপিলে হয়তো তিন মাইল লম্বা হইয়া যাইবে, কিন্তু দীর্ঘ পরিধির মধ্যে এমন একটি কবিতা তাহার নাই যাহা কিশোর মনে স্বপ্ন সৃষ্টি করিতে পারে। আমি ভবিষৎবাণী করিতেছি-এই কবিতা আপনাকে অমর করিয়া রাখিবে।"[৯]

কবি ইসলামকেই তাঁর জীবনের আদর্শ হিসেবে বেছে নিয়েছিলেন। কবি **১৯৫৭** খ্রিস্টাব্দে বরিশাল ইসলামি সাহিত্য সম্মেলনে বলেছিলেন,

"ইসলাম নিজেই যখন মিলন ও সমন্বয় প্রয়াসি, তখন ইসলামি সাহিত্য কেনো হবে সংকীর্ণ বা অনুদার। দেশ, জাতি, সমাজ, ধর্ম, শিল্প ও সংস্কৃতিই হোক ইসলাম সর্বত্রই মিলেছে-মিলিয়েছে। খণ্ডতা বা ক্ষুদ্রতার স্বপ্ন যেখানেই ভিড় জমিয়েছে সেখানেই প্রয়োজন হয়েছে ইসলামের, সকলের জন্য স্থান সংকুলান করাই ইসলামের কাজ, নিজে থাকবে অপরকে থাকতে দেবে এই হলো তার নীতি।"[১০]

কবিতা ও সাহিত্য রচনা

গোলাম মোস্তফা মাত্র ১৩ বছর বয়সে লেখা-লেখি শুরু করেন। দশম শ্রেণির ছাত্র থাকা অবস্থায় '*আন্দ্রিয়ানোপল উদ্ধার*' কবিতা লেখেন। এটি ছিল তাঁর প্রথম প্রকাশিত কবিতা। এ কবিতা পাঠকমহল, সুধীজন, সুবিবেচক, বুদ্ধিজীবি সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে সক্ষম হয়েছিল। তিনি মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত জাতির প্রয়োজনে একের পর এক গদ্য, পদ্য ও সাহিত্যের অসংখ্য লেখা উপহার দিয়েছেন। বিশ্বনবি, রক্তরাগ, খোশরোজ, বনি আদম, আমার চিন্তাধারা, ইসলাম ও কমিনিউজম, ইসলাম ও জিহাদ, হযরত আবু বকরসহ জনপ্রিয় বহুসংখ্যক গ্রন্থ রচনা করে বাংলা সাহিত্য ভাণ্ডারকে সমৃদ্ধ করেছেন। তিনি বঙ্গীয় মুসলিম সাহিত্য পত্রিকা (১৯১৭ খ্রি.), আল-ইসলাম (১৯১৫ খ্রি.), সাধনা (১৯১৬ খ্রি.), সহচর (১৯১৫ খ্রি.), সওগাত (১৯১৭ খ্রি.), মাসিক মোহাম্মদী (১৯১৬ খ্রি.), ইসলাম দর্শন (১৯২৭ খ্রি.), মাহে নত্ত, সত্য বার্তা (১৯৩৮ খ্রি.), মোয়াজ্জিন (১৯৩৮ খ্রি.) প্রভৃতি সাময়িক পত্রিকায় নিয়মিত লেখেন এবং তা প্রকাশিত হয়।[১১]

কবি গোলাম মোস্তফা যে সব উপন্যাস, কাব্যকাহিনী, কাব্য, কাব্যানুবাদ, গল্প, জীবনী, ধর্মীয়, রাজনীতি ও ইতিহাস সম্পর্কিত রচনাবলি লেখেন তা গ্রন্থাকারে সংকলিত ও প্রকাশিত হয়েছে। তাঁর রচনাবলির তালিকা নিম্নরূপ-

ক. **উপন্যাসঃ** ১. সাহারা (১৯৩৫ খ্রি.), ২. হাসনাহেনা (১৯২৮ খ্রি.)।

খ. **কাব্যকাহিনী (১৯৩৮** খ্রি.): ১. রূপের নেশা (১৯২৬ খ্রি.), ৩২. ভাঙ্গা বুক (১৯২১ খ্রি.)।

গ. **মৌলিক কাব্যঃ** ১. রক্ত রাগ (১৯২৪ খ্রি.), ২. তারানা-ই-পাকিস্তান (১৯৫৬ খ্রি.), ৩. বনী আদম প্রথম খণ্ড (১৯৫৮ খ্রি.), ৪. আমরা নতুন আমরা কুড়ি কিশোর কবিতা (১৯৮০ খ্রি.), ৫. হাসনাহেনা (১৯২৮ খ্রি.), ৬. কাব্যকাহিনী (১৯৩৮ খ্রি.)।

ঘ. **কাব্যানুবাদ ও গল্প সংকলনঃ ১.** মুসাদ্দাস-ই-হালী (১৯৪১ খ্রি.), ২. কালামে ইকবাল (১৯৫৭ খ্রি.), ৩. শিকওয়া (১৯৬০ খ্রি.), ৪. জবাব-ই-শিকওয়া (১৯৬০ খ্রি.), ৫. আল-কুরআন (১৯৫৭ খ্রি.), ৬. জয় পরাজয় (গল্প সংকলন ১৯৬৯ খ্রি.)।

ঙ. **কাব্য সংকলনঃ ১.** বুলবুলিস্তান (১৯৪৯ খ্রি.), ২. কাব্য গ্রন্থাবলী ১ম খণ্ড (১৯৭১ খ্রি.), ৩. কাব্য সংকলন (কবিতা ১৯৬০ খ্রি.)।

চ. **জীবনী গ্রন্থঃ ১.** বিশ্বনবি (১৯৪২ খ্রি.), ২. মরুদুলাল (১৯৪৮ খ্রি.), ৩. বিশ্বনবির বৈশিষ্ট্য (১৯৬০ খ্রি.), ৪. হজরত আবু বকর (১৯৬৫ খ্রি.)।

ছ. **ধর্ম বিষয়ক গ্রন্থঃ ১.** ইসলাম ও জিহাদ (১৯৪৭ খ্রি.), ২. ইসলাম ও কমিউনিজ্‌ম (১৯৪৯ খ্রি.)।

জ. **রাজনীতি ও ইতিহাস বিষয়ক গ্রন্থঃ** ১. ইতিহাস পরিচয় (রাজনীতি ১৯৪৭ খ্রি.), ২. পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা, ৩. অবিস্মরণীয় বই (ইতিহাস সম্পাদনা ১৯৬০ খ্রি.)।

ঝ. প্রবন্ধ সংকলন: আমার চিন্তাধারা (প্রবন্ধ সংকলন ১৯৬২ খ্রি.)।

ইন্তিকাল

গোলাম মোস্তফা ১৯৬৪ খ্রিস্টাব্দের ১৩ অক্টোবর মঙ্গলবার রাত ১১টায় ইন্তিকাল করেন। তাকে আজিমপুর কবরস্থানে দাফন করা হয়।

গোলাম মোস্তফার *'বিশ্বনবি'* পর্যালোচনা

গোলাম মোস্তফা রচিত গ্রন্থাবলীর মধ্যে *'বিশ্বনবি'* (১৯৪২ খ্রি.) অন্যতম। হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর জীবন চরিত বিষয়ক এ অমূল্য গ্রন্থটি ১৯৪২ খ্রিস্টাব্দের অক্টোবরে প্রথম সংস্করণ, ১৯৪৬ খ্রিস্টাব্দে দ্বিতীয় সংস্করণ ও ১৯৬৩ খ্রিস্টাব্দে অষ্টম সংস্করণ ৫৮৭ পৃষ্ঠায় প্রকাশিত হয়। ২০০৪ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত এটি ৩০বার মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়। রাসূল চরিত বিষয়ক গ্রন্থ হিসেবে এর অনন্যতা অনস্বীকার্য। গ্রন্থটি শুধু সাধারণ মুসলিম পাঠকের কাছেই নয়, বরং বুদ্ধিজীবী, সুধীজন ও পণ্ডিতগণের কাছেও রাসূলের জীবন চরিত বিষয়ক অত্যন্ত জনপ্রিয় একটি গ্রন্থ। গ্রন্থটি সুপরিকল্পিতভাবে ছাঁচে ঢেলে সৃষ্টি করা হয়েছে। এতে হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর জীবন ও চরিত্র নিয়ে সন্দেহযুক্ত প্রতিটি প্রশ্নের যুক্তিভিত্তিক উত্তর দিয়ে রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর মহত্ব ও শ্রেষ্ঠত্বকে প্রমাণ করার চেষ্টা করা হয়েছে।

বিশ্বনবি গ্রন্থের খণ্ড, পরিচ্ছেদ বিন্যাস ও আলোচিত বিষয়বস্তু

বিশ্বনবি গ্রন্থটি দু'টি খণ্ডে বিভক্ত। প্রথম খণ্ড ৫৮টি পরিচ্ছেদ এবং দ্বিতীয় খণ্ড ১৪টি পরিচ্ছেদে আলোচনা বিদ্যমান রয়েছে। প্রতিটি পরিচ্ছেদের আলোচনা অত্যন্ত যুক্তিযুক্ত, হৃদয়গ্রাহী ও প্রাঞ্জল। *'বিশ্বনবি'* নিঃসন্দেহে একটি গবেষণা গ্রন্থ, যা সর্বসাধারণের বোধগম্যও। এর কোনো আলোচনা যুক্তির ভারে ন্যুব্জ হয়ে পড়েনি, আবার আবেগের বশবর্তী হয়ে কোনো অযৌক্তিক আলোচনাও প্রশ্রয় পায় নি।[১২] অতএব আকৃতিতে যে এ গ্রন্থটি বিশাল এতে কোনো সন্দেহ নেই। গ্রন্থটি বিশ্লেষণমূলক ও গবেষণাধর্মী। দ্বিতীয় সংস্করণের ভূমিকায় তিনি তিনটি নতুন প্রবন্ধ সংযোজন করার ব্যাখ্যা দিয়েছেন। কবি গ্রন্থের ভূমিকায় লিখেছেন,

'বিশ্বনবি আগাগোড়া একবার দেখিয়া দিয়াছি। বহু স্থানে ফুটনোট দিয়াছি অথবা কিছু কিছু পরিবর্তন ও পরিবর্ধন করিয়া আমার ধারণালোকে অধিকতর সুস্পষ্ট করিতে চেষ্টা করিয়াছি। হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর বহু বিবাহের তাৎপর্য স্বতন্ত্রভাবে আলোচিত হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত 'ফিলসফী ও মিরাজ', ইসলাম কি? এবং হযরত মুহাম্মদ (সা.) কে? এই তিনটি নতুন প্রবন্ধ সংযোজিত হইয়াছে।'[১৩]

কবি পূর্বে গ্রন্থটি প্রকাশ করে পূর্ণ তৃপ্তি পান নি। তাঁর ভূমিকার কয়েকটি বাক্য এর প্রমাণ। সেখানে তিনি লিখেছেন,

'এই আলোচনা চূড়ান্ত নির্দেশন নয়। আরও এমন অনেক কথা আছে যাহা এখানেও বলা হয় নাই, যাহা এই অধম লেখকের জ্ঞান, চিন্তা ও দৃষ্টিসীমার বাহিরে পড়িয়া আছে।'[১৪]

এভাবে প্রায় প্রতিটি সংস্করণে আরও বিশুদ্ধতর করার চেষ্টা করেছেন। এ ভূমিকার আরও এক স্থানে তিনি লিখেছেন,

> 'এই আলোকের যুগে ইসলাম ও হযরত মুহাম্মদ (সা.)-কে উন্নতভাবে বুঝিবার সময় আসিয়াছে। *'বিশ্বনবি'*তে আছে সেই প্রয়াস। আধুনিক যুগে দর্শন ও বিজ্ঞান সম্বন্ধে খানিকটা জ্ঞান থাকা দরকার, তাই পাঠক-পাঠিকাদের জ্ঞানার্জন করা অপরিহার্য হইয়া পড়িয়াছে। জড়বাদ, অদ্বৈতবাদ, ডায়ালেকটিস ইত্যাদি কাহাকে বলে? স্থান, কাল, পাত্রভেদে আধুনিক বিজ্ঞানের মত কি? বৈজ্ঞানিকদের লক্ষ্য কোন দিকে এ সব বিষয়ে পাঠক পাঠিকার সজাগ হইতে হইবে। মনন শক্তির উৎকৃষ্ট না হইলে জাতীয় জীবন শক্তিশালী হয় না।'[১৫]

কবির এ বক্তব্য থেকে বুঝা যায় যে অল্পশিক্ষিত ও জ্ঞানহীন পাঠকের কাছে তিনি তাঁর বিশ্বনবির চরিত ব্যাখ্যা করতে চান নি। বরং কবি গোলাম মোস্তফা ছিলেন আধুনিক বিজ্ঞানমনস্ক ও বিংশ শতকের প্রতিনিধি। যুক্তির ভিত্তি ছাড়া যখন শিক্ষিত মনকে আকর্ষণ করা দূরহ তখন সে বিজ্ঞান শিক্ষিত মানুষকে তার উপলব্ধি সত্যকে সমর্থন করতে শুধু যে আবেগ যথেষ্ট হবে সেটা অনুমান করেই তিনি তার শিক্ষার শক্তির সবটুকু উজাড় করে বিশ্বনবি রচনায় মনোনিবেশ করেন। বিশ্বনবির অষ্টম সংস্করণ শেষে তিনি এই গ্রন্থ রচনায় গৃহীত তথ্যের একটি তালিকা দিয়েছেন। ব্যবহৃত সে গ্রন্থগুলোর প্রকৃতি দেখলেই একথা অনুধাবন করা সহজ হবে যে, তাঁর জ্ঞানের বিশালতা প্রাজ্ঞতার পরিধি কতটা গভীরে প্রথিত।

'বিশ্বনবি' রচনায় গোলাম মোস্তফা কি ধরনের প্রস্তুতি নিয়েছিলেন তা উপরে উদ্ধৃত তাঁর বক্তব্য থেকে সহজেই অনুমেয়। রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করতে হবে সেসব মনীষীদের কাছে যারা সহজ যুক্তিতে হার মানেন না। তিনি একাধারে হিন্দু, বৌদ্ধ এবং খ্রিস্ট ধর্মের শাস্ত্র জ্ঞান লাভ করতেন, ঐসব ধর্মের উপর লিখিত গ্রন্থ যেমন পাঠ করেছেন তেমনি বিজ্ঞান-জ্ঞান লাভের জন্য পরিশ্রম করতে পিছপা হন নি। রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর প্রতি গভীর জ্ঞান ও ভালোবাসাই তাকে পরিশ্রমের প্রতি নিবেদিত করেছিল। তিনি *'বিশ্বনবি'*র প্রথম সংস্করণের ভূমিকায় লিখেছেন,

'হযরতের জীবনী সংক্রান্ত আরবি, উর্দু, ইংরেজি ও বাংলা বহু গ্রন্থই দেখিবার সৌভাগ্য হইয়াছে, কিন্তু সেগুলোর মধ্যে একটা বিষয়ের অভাব লক্ষ্য করিয়া নিরাশ হইয়াছি। অনুভূতির আবেদন খুব কম গ্রন্থেই দেখিতে পাওয়া যায়। ফলে অধিকাংশ লেখাই হযরতের জীবনীর সৌন্দর্যলোকে প্রবেশ করিতে পারে নাই।'[১৬]

'বিশ্বনবি' দু'টি খণ্ডে বিভক্ত-প্রথম খণ্ডে মোট আটান্নটি অধ্যায় আছে, এ অংশে হযরত মুহাম্মাদ (সা.)-এর জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত ঘটনার বিস্তারিত বর্ণনা আছে। এ অংশে হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর জীবন, আদর্শ, ইসলাম প্রচার, ধর্মীয় তাৎপর্য, যুদ্ধের পটভূমি, আরব দেশে ইসলাম প্রচারের বিভিন্ন দিক বর্ণনার

সময় লেখকের আবেগপূর্ণ মনোভাব প্রাধান্য পেলেও শুধু আবেগেই প্রধান হয়ে উঠেনি, আবেগের সাথে মিলিত হয়েছে সম্ভাব্য যুক্তি নিষ্ঠা। দ্বিতীয় অংশটি ক্ষুদ্রাকৃতির চৌদ্দটি অধ্যায় নিয়ে রচিত। এখানে লেখক ইসলাম ধর্মের কয়েকটি দিক এবং হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর জীবনের কতকগুলো দিক সম্পর্কে যৌক্তিক ব্যাখ্যা দিয়েছেন।

গোলাম মোস্তফার রচনার বৈশিষ্ট্য হলো জীবন-বহির্ভুত তাত্ত্বিক দিক বর্ণনায় তাঁর যুক্তিবাদী মন বিশেষভাবে প্রকাশিত। এখানে তিনি আবেগতাড়িত হয়ে কোনো দিক ব্যাখ্যা করেন নি।

প্রথম খণ্ড এবং দ্বিতীয় খণ্ডের প্রতিটি পরিচ্ছেদ তিনি যেভাবে উপস্থাপন করেছেন তাতে তার নির্বাচিত বিষয়ের মধ্যে বুদ্ধির চোখ এড়ায় না। এখানে তার মেধাকে তিনি কৌশলী আইনজ্ঞের মত ব্যবহার করেছেন। প্রকৃতপক্ষে যাতে তার যুক্তিখণ্ডনের কোনো সুযোগ না পায় তার তীক্ষ্মদৃষ্টি সেদিকে পূর্ণ সজাগ ছিল।

রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-কে দুনিয়ার নিয়ন্ত্রিত গণতন্ত্রের স্রষ্টা বলে তিনি মনে করেছেন। *'বিশ্বনবি'*র একটি গুরুত্বপূর্ণ পরিচ্ছেদ বিভিন্ন ধর্ম ও ধর্মস্রষ্টাদের মধ্যে তুলনামূলক আলোচনা। এ তুলনামূলক আলোচনায় গোলাম মোস্তফা যেমন ইসলামের শ্রেষ্ঠত্ব দেখিয়েছেন তেমনি রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর শ্রেষ্ঠত্ব দেখিয়েছেন। উল্লেখ্য রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করার জন্য তার অন্যতম যুক্তি হল যে তিনি খাঁটি ঐতিহাসিক ব্যক্তি। তিনি লিখেছেন,

> 'সংক্ষেপে এই কথায় বলতে চাই যে উপরে যে, সমস্ত মহাপুরুষদের নামোল্লেখ করিলাম তাদের মধ্যে একজনও হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর মত পরিপূর্ণ (Perfect) নহেন। তাহাদের পূর্ণ পরিচয় ইতিহাসে লিপিবদ্ধ নাই। অথচ হযরত মুহাম্মদ হইতেছেন খাঁটি ঐতিহাসিক ব্যক্তি তাহার জন্ম হইতে মৃত্যুকাল পর্যন্ত জীবনের খুঁটিনাটি বিষয়েরই বিস্তৃত বিবরণ মওজুদ রয়েছে। জীবনের প্রতি স্তরে, প্রতি পদক্ষেপে আমরা যে সব সমস্যার সম্মুখীন হই তার সবগুলোর সমাধান দেখতে পাই এই আদর্শ মহান পুরুষের মধ্যে।'[১৭]

একজন মহামানবের শ্রেষ্ঠত্ব বিচারে মননশীল শিক্ষিত প্রত্যেক ব্যক্তির মনে যেসব প্রশ্ন আসতে পারে যেমন তিনি, 'মানব জীবনের বিভিন্ন সমস্যার সমাধান করিয়া গিয়াছেন কিনা? যুগ-সমস্যার সমাধানকল্পে কতখানি সহায়ক, নারী, দাস-দাসী, শত্রু-মিত্র, স্বদেশী, স্বধর্মী-বিধর্মী সর্বশ্রেণীর লোকের সহিত কীরূপ ব্যবহার করিয়াছিলেন বা করিতে বলিয়াছিলেন, কাহার ধর্ম-কত উদার আর কত ব্যবহারোপযোগী ইত্যাদি বিষয়ের পরিপ্রেক্ষিতে তিনি এ বিচার করিয়াছেন।

মোদ্দাকথা অন্য দশজন নবি জীবনীর চেয়ে *'বিশ্বনবি'* যে সম্পূর্ণ ভিন্ন চরিত্রের তাতে কোনো সন্দেহ নেই। তাঁর পূর্বে শেখ আব্দুর রহীম[১৮] (১৮৫৯-১৯৩১ খ্রি.), মাওলানা মোহাম্মদ আকরম খাঁ[১৯] (১৮৬৮-

১৯৬৮ খ্রি.) রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর জীবনী লিখেছেন। কিন্তু গোলাম মোস্তফার মধ্যে বিশ্বাস ও আবেগের, ভক্তি ও প্রেমের যে গভীরতা দেখা গেছে তার সঙ্গে উপরোল্লিখিত গ্রন্থদ্বয়ের কিছু পার্থক্য আছে। গোলাম মোস্তফার কথা দিয়েই বলা যায় আশেকে রাসূলুল্লাহ্ (সা.) না হইলে সত্যিকার রাসূলকে দেখা যায় না।'[২০] 'বিশ্বনবি'র লেখকের মধ্যে সেই আশেকে রাসূল (সা) উজ্জ্বল হয়ে উঠেছেন।

রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর জীবনী রচনা সে লেখকের পক্ষে সম্ভব যিনি ইসলামি জ্ঞানে প্রজ্ঞাবান। ইতিহাস এবং ইসলাম বিশেষজ্ঞ না হয়ে রাসূল-জীবনী লিখবেন তাঁকে যেমন ধর্ম-বিশেষজ্ঞ বা শাস্ত্র-বিশেষজ্ঞ হলে হবে না, তাঁকে প্রতিভাবান লেখক হতে হবে এবং যে ভাষায় তিনি লিখছেন সে ভাষায় তাঁর থাকতে হবে পূর্ণ অধিকার।

তাঁকে আরও হতে হবে জ্ঞান ও কল্পনাশক্তির অধিকারী; মহাপুরুষের জীবন চরিত্র উপলদ্ধিতে সূক্ষ্মদর্শী। সবার উপরে ইসলাম ও রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর প্রতি বিশ্বাস, প্রেম ও ভক্তিতে হতে হবে একান্ত আন্তরিক। রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর জীবনী লেখায় সে যোগ্যতা, দক্ষতা, প্রতিভা ও অধ্যবসায়ের পরিচয় অনেকে দিতে পারেন নি। অনেকে আবার রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর জীবনী লিখেছেন তাঁর চরিত্র-ক্রুটি প্রদর্শনের জন্য, তার নিখুঁত চরিত্রের অপরূপত্ব প্রদর্শনের জন্য নয়। সাইয়েদুল মুরসালীন-এর লেখক আব্দুল খালেক তার 'সাইয়েদুল মুরসালীন'র 'অবতরণিকায়' লিখেছেন,

> 'সমগ্র জগতের সঙ্গে সঙ্গে মুসলিম জাহানের বিরাট এক অংশও আজ জড়বাদের প্রবল ধারায় ভাসিয়া যাইতে চলিয়াছে। জড়বাদের ক্ষণস্থায়ী ও কৃত্রিম মোহে অন্ধ হইয়া আজ বহু মুসলমানই তাওহীদের সহিত উহার একটি অবিচ্ছেদ্য যোগসূত্র স্থাপন করিবার অপচেষ্টায় উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছেন; কিন্তু ইহাদের মধ্যে যে একটি অহি-নকুল সম্বন্ধ ইহা তাহাদের নিকট সম্পূর্ণ অজ্ঞাত এবং অবজ্ঞত। আল্লাহর অস্তিত্বে সংশয়, কুর'আন, হাদীস, মুজিযা প্রভৃতির প্রতি অবিশ্বাস ও অভক্তি ঈমানের মূলে কুঠারঘাত হানিয়াছে। ঈমানকে বিসর্জন দিয়া ও ইসলামকে বাদ দিয়া ইসলামের নামে দুই একটি অনুশাসন লইয়া কলমবাজী ও গলাবাজীর পরাকাষ্ঠ প্রদর্শন ঐ অপচেষ্টারই বিভিন্নমুখী প্রকাশ মাত্র। ঐ সমস্ত অপকর্ম আজ মুখের কথাতেই সীমাবদ্ধ নহে, লিখনীতেও তাহা আত্মপ্রকাশ করিয়াছে।'[২১]

ঐ সমস্ত ভাবধারায় প্রভাবান্বিত তাফসির রাসূলুলাহ (সা.)-এর জীবনী ও নানা প্রকার ধর্মীয় গ্রন্থে দেখা য়ায়। তিনি লিখেছেন,

'অতীব দুঃখের বিষয় এই যে, যাহারা মুফাসসির নহেন তাঁহারাই আজ মুফাসসির, যাঁহারা মুহাদ্দিস নহেন তাহারাই আজ মুহাদ্দিস, যাঁহারা ফকিহ নহেন তাহারাই আজ ফকিহ, যাহারা মুফতি নহেন তাহারাই আজ মুফতি, যাহারা আলেম নহেন তাহারাই আজ আলেম'।[২২]

রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর জীবনী লিখতে ইসলাম সম্পর্কে বিশেষ পারঙ্গমতার প্রয়োজন। সে সম্পর্কে উল্লেখ করে তিনি লিখেছেন,

> 'তাহাদের নিকট যাহা মনঃপুত ও হৃদয়গ্রাহী তাহাই ইসলাম, যদিও ইসলামের সহিত তাহার সম্বন্ধ নাই এবং যাহা মনঃপুত ও হৃদয়গ্রাহী নহে তাহাই প্রকৃত ইসলাম নহে, অপর কথায় নিজেদের খোশ খেয়ালকে চরিতার্থ করাই তাহাদের নিকট দীন'। ইহা ইয়াহুদি মতবাদ ছাড়া আর কিছুই নহে। যাহারা এই অপচেষ্টায় লিপ্ত তাহারা ইসলাম ও ঈমান, ইসলাম ও রূহানীয়াতকে বিভ্রান্ত করিবার প্রচেষ্টায় লিপ্ত থাকে। তাহার জীবনের যে সমস্ত ঘটনা ও কার্যকলাপ আধুনিক সভ্য জগতের রুচিসম্মত নহে; ঈমান এবং ইসলামের বিনিময়ে হইলেও তাহারা তাহা দ্বিধাহীন চিত্তে উপেক্ষা করিয়া গিয়াছেন।'[২৩]

এ বক্তব্য থেকে একটি বিষয় স্পষ্ট যে ইসলাম একটি বিস্তৃত বিষয় এবং যে বিষয় সম্পর্কে সম্পূর্ণ ওয়াকিবহাল নন এমন ব্যক্তির পক্ষে রাসূল (সা.)-এর জীবনী লেখা অনূচিত। তিনি ঐ সমস্ত লেখক বা তাদের লেখা গ্রন্থের নামোল্লেখ করেন নি। তবে ১৯৫১ খ্রিস্টাব্দে তার লেখা সীরাত গ্রন্থ 'সাইয়েদুল মুরসালিন' প্রকাশিত হওয়ার আগে বাংলা সাহিত্যে রাসূল (সা.)-এর তিনটি জীবনী প্রকাশিত হয়।[২৪]

'*বিশ্বনবি*'র তথ্যপঞ্জি

শেখ আবদুর রহিম ও মাওলানা আকরম খাঁর রাসূলুল্লাহ্ (সা.) জীবনী লেখার মতো ধর্মীয় শিক্ষা ছিল। কবি গোলাম মোস্তফা এবং মাওলানা আকরম খাঁ ইংরেজি শিক্ষিত ছিলেন এবং তিনি ইংরেজির মাধ্যমে রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর জীবনী অভিনিবেশ সহকারে পাঠ করেছিলেন। গোলাম মোস্তফা তার '*বিশ্বনবি*'তে যে গ্রন্থ তথ্যপঞ্জি দিয়েছেন সেখানে মাওলানা শিবলী নোমানীর উর্দুতে লেখা 'সীরাতুন্-নবি' গ্রন্থের কথা উল্লেখ করেছেন। ইংরেজিতে লেখা খাজা কামাল উদ্দীনের The Ideal Prophet, কে.এল গবার The Prophet of The Desert, উইলিয়াম ম্যুরের Life of Muhammad, স্যার ডব্লিউ আরভিং এর Life of Muhammad, মারগোলিয়াথের Muhammad, মাওলানা মোহাম্মদ আলীর Muhammad, গোলাম সারওয়ারের Muhammad, সৈয়দ আমীর আলীর The Spirit of Islam, আব্দুল হক বিদ্যারথীর Prophet in the world Scripture, জন ক্লার্ক আর্চারের Mystical Elements in Muhammad প্রভৃতি গ্রন্থের কথা উল্লেখ করেছেন। তিনি আরবিতে

লেখা সীরাতু ইব্ন হিশাম, মা রেজন নবুয়ত এবং মাদারেযুন নবুয়তের কথাও উল্লেখ করেছেন। এখানে বলা প্রয়োজন, তিনি আল-কুর'আনুল কারিমের অনুবাদ করেছিলেন।
অতএব মুহাদ্দিস, মুফাস্সির ও প্রচলিত অর্থের আলিম না হলেও ইসলামকে তিনি জেনেছিলেন। তবে আকরম খাঁর 'মোস্তফা চরিত' এবং সৈয়দ আমীর আলীর The Spirit of Islam পড়লে গোলাম মোস্তফার '*বিশ্বনবি*'র সীমাবদ্ধতা উপলব্ধি করা যায়। ঐ তিন জন লেখকই রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর চরিত্র মহিমা এবং মানব শ্রেষ্ঠ হওয়ার কারণ যুক্তি সহকারে উপস্থাপন করার সাধ্যমত চেষ্টা করেছেন এবং তাদের পরিকল্পনা ও দৃষ্টিভঙ্গির স্বাক্ষর রেখেছেন। আমীর আলীর ইতিহাস জ্ঞান আকরম খাঁর লেখায় যেমন কম পাওয়া যায় তেমনি আকরম খাঁর শাস্ত্রজ্ঞান গোলাম মোস্তফার লেখায় তেমন বিশদভাবে দেখা যায় না।

মনে হয় আকরম খাঁর পক্ষে আরবি জানার কারণে ইসলামকে যতটা গভীরভাবে উপলব্ধি করার ও জানার সুযোগ ঘটেছিল সে সুযোগ গোলাম মোস্তফার হয় নি। তার ইসলাম উপলব্ধির মধ্যে ভালোবাসার অভাব নেই কিন্তু তার তলদেশে পৌঁছাবার স্বতঃস্ফুর্ততার এবং সহজতার অভাব আছে।[২৫]

মোস্তফা চরিত পড়লে মনে হয় আকরম খাঁ শাস্ত্রীয় ইসলামের খুঁটিনাটি বিষয় সম্পর্কে বেশি অভিজ্ঞ এবং সূলমঘ সূক্ষ্মজ্ঞানী। অবশ্য মোস্তফা চরিত এবং '*বিশ্বনবি*' দু'টো গ্রন্থেই একটা Defensive Attitude আছে। এ Defensive Attitude অনেক সময় গোলাম মোস্তফার '*বিশ্বনবি*' এবং আকরম খাঁর 'মোস্তফা চরিত' এ প্রতিবাদী ভাষ্য হয়ে উঠেছে।

পাশ্চাত্য লেখকেরা রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর জীবনী রচনায় যে সব মন্দ সমালোচনা করেছেন আকরম খাঁ বলিষ্ঠ যুক্তিতে সে সমালোচনার জবাব দিয়েছেন বিশদ তথ্যসহ। তিনি সৈয়দ আমীর আলীর The Spirit of Islam এ পাশ্চাত্য ঘেষা কিছু দুর্বল উক্তির সমলোচনা করতেও দ্বিধা করেন নি। আবদুল খালেক যেমন রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর জীবনী লেখকদের লেখায় ত্রুটি দেখেছেন তেমনি আকরম খাঁ পাশ্চাত্য লেখা সমেত উপমহাদেশের লেখকদের রাসূলুল্লাহর (সা.) জীবনী লেখার ত্রুটি দেখেছেন। এ থেকে সৈয়দ আমীর আলী কিংবা আল্লামা শিবলী নোমানী বাদ যান নি। গোলাম মোস্তফা বলেছেন,

> 'মহা-পুরুষদের জীবন শুধু ঘটনার ফিরিস্তি নহে, শুধু যুক্তি তর্কের কন্টক শয্যাও নহে; সে একটা ভক্তি, শ্রদ্ধা, বিস্ময় ও অনুভবের বস্তুতঃ তাহাকে বুঝিতে হইলে একদিকে যেমন চাই সত্যের আলোক ও বিজ্ঞানের বিচার বুদ্ধি, অপরদিকে ঠিক তেমনি চাই ভক্তের দরদ, কবির সৌন্দর্যানুভূতি, দার্শনিকের অন্তদৃষ্টি, আর চাই প্রেমিকের প্রেম। আশেকে রাসূল না হইলে সত্যিকার রাসূলকে দেখা যায় না।'[২৬]

প্রত্যেকে অন্যের ক্রটি দেখার ফলেই রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর বিশদ জীবনী লেখার যে অন্তর্গত তাগিদ অনুভব করেছেন, শেষ পর্যন্ত মুসলিম সমাজের জন্য তা উপকারী হয়েছে। সবাই কিন্তু রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর প্রতি গভীর ভক্তি ও ভালোবাসা থেকে এ অনুপ্রাণিত কাজে হাত দিয়েছেন এবং সর্বশক্তি দিয়ে, সাধনা ও অধ্যবসায় দিয়ে রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর জীবনী লেখায় নিবেদন করেছেন। এ দৃষ্টিকোণের পার্থক্য সে জন্যে অনেক সময় বিরূপ ফল সৃষ্টি না করে শুভ ফল সৃষ্টি করে একথা দৃঢ়ভাবে বলা যায়।

গোলাম মোস্তফার 'বিশ্বনবি'তে আলোচিত রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর জীবন বৃত্তান্ত পর্যালোচনা

'বিশ্বনবি' গোলাম মোস্তফার সাহিত্য জীবনের শ্রেষ্ঠকীর্তি এবং অন্যতম শ্রেষ্ঠ সম্পদ। এ গ্রন্থটি যখন প্রকাশ হয় তখন তিনি ৪৫ বছরের যুবক। বয়সের কারণে এবং ব্যাপক অনুশীলনের ধারাবাহিকতা পার হয়ে আসায় যে ভারসাম্যপূর্ণ এবং পরিমিতি বোধসম্পন্ন মানসিকতা তার মনন ও প্রজ্ঞাকে শাণিত করেছিল, বিদগ্ধতা দান করেছিল, তারই সফলতম উপস্থাপনা *'বিশ্বনবি'*র গদ্য-শরীর।

রাসূলুল্লাহ্ (সা.) রাহমাতুল্লিল আলামীন। এক অনন্য চরিত্র ও ব্যক্তিত্বের অধিকারী ছিলেন তিনি। তাঁর ঘটনাবহুল ও বর্ণিল জীবন বাস্তবিক, সুন্দর ও উৎকৃষ্টতম এক মহাকাব্যের অনুষঙ্গ। তাঁর অসাধারণ ও অনুপম আদর্শের আলোকে শিখা যে কোনো মানুষকে উদ্বেলিত এবং আলোড়িত করে। এ কারণেই রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর জীবনী রচনার ভাষায় ভক্তির উচ্ছ্বাস, আবেগের অন্তরঙ্গ তরঙ্গ সহজেই লক্ষণীয়। গোলাম মোস্তফাও তার ব্যতিক্রম নন। তিনি আপাদমস্তক রোমান্টিক চেতনায় উদ্বেলিত একজন কবি হওয়ার কারণে বিশ্বের শ্রেষ্ঠতম রাসূলের জীবনী রচনা করতে গিয়ে তিনি ভক্তের এবং কবির বিমুগ্ধ হৃদয়ের সমস্ত আবেগ উজাড় করে ঢেলে দিয়েছেন *'বিশ্বনবি'*র প্রতিটি পাতায়।

বস্তুত 'বিশ্বনবি'র সুবৃহৎ আঙ্গিকে গদ্য কোথাও নিরস কাঠিন্যে হোঁচট খেয়ে পড়ে নি। এক চমৎকার সৌন্দর্য সব সময় গদ্য-শরীরে কবিত্বের পেলব স্পর্শ দিয়ে গেছে। কবি সৈয়দ আলী আহসান বলেন,

> 'কবি গোলাম মোস্তফার *'বিশ্বনবি'* গ্রন্থটি খুবই জনপ্রিয়। তিনি নিজেকে একজন আন্তরিক অনুগত বিশ্বাসী পুরুষ হিসাবে এই গ্রন্থের মধ্য দিয়ে প্রতিষ্ঠা করেছেন। মহানবির জীবনের অলৌকিক রহস্যের প্রতি তাঁর অপরিসীম শ্রদ্ধা তিনি এই গ্রন্থের মধ্য দিয়ে ব্যক্ত করেছেন। আবেগময় ভাষায় তিনি মহানবি (সা.)-এর জীবনীকে আগ্রহী পাঠকের কাছে উপস্থাপন করেছেন।'[২৭]

এ কারণে বৃহৎ আকারের হওয়া সত্ত্বেও *'বিশ্বনবি'* পড়তে গিয়ে কখনই ক্লান্তিতে আচ্ছন্ন হতে হয় না। প্রখ্যাত ঔপন্যাসিক ও লেখক মনোজ বসুর ভাষায়,

> আপনার *'বিশ্বনবি'* পড়লাম। অপূর্ব! জাতির একটা বড় কাজ করলেন আপনি। মহামানুষেরা সর্বকালে ও সর্বদেশের সম্পত্তি। ভক্তির অন্ধ আবেগ অনেক সময়েই নিখিল

নর-নারীর নিকট থেকে তাঁদের আড়াল করে রাখতে চায়। কিন্তু মহানবির পরমাশ্চর্য বৃত্তান্ত লিখবার সময় আপনার কবিধর্ম সর্বদা আপনাকে গণ্ডিসংকীর্ণতার ঊর্ধে রেখেছে। আমি ও আমার মত আরও অনেকে ধর্মে মুসলমান না হয়েও হযরতকে একান্ত আপনার বলে অনুভব করতে পারলাম। মহানবির কাছে পৌঁছাবার এই সেতু রচনা আপনার অতুলনীয় সাহিত্য-কীর্তি। ভাষা কবিত্ব-ঝঙ্কার ও ভাবলালিত্যে অপরূপ মহিমা লাভ করেছে।'[২৮]

অধ্যাপক হাসান আবদুল কাইয়ূমের ভাষায়,

'এই গ্রন্থের (বিশ্বনবি)'র ভাষা সাধু গদ্য হলেও এর প্রয়োগ পদ্ধতিতে বিদ্যমান কাব্যিক ব্যঞ্জনা মনকে দোলা দেয়। গ্রন্থের ভাষণার গতিময়তা এবং এতে উপস্থাপিত তথ্যগত ও তত্ত্বগত আলোচনা হৃদয় গভীরে নবি প্রেমের পরশ অনুভূত হয়, হৃদয়-মন নবি প্রেমে উদ্বেলিত হয়ে ওঠে।'[২৯]

গোলাম মোস্তফার 'বিশ্বনবি' ও 'হযরত মুহাম্মদের জীবনী' গ্রন্থ বলে 'মোস্তফা চরিত' ও 'মরুভাষ্করে'র সঙ্গে স্বাভাবিকভাবে তুলনা করা যেতে পারে। *'বিশ্বনবি'* রচনার সময় লেখক আকরম খাঁর মত বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে জীবনীগ্রন্থ রচনা না করলেও তিনি সর্বত্র যে আবেগপ্রবণতা দ্বারা তাড়িত হয়েছেন তা নয়। তবে, একথাও যথার্থ যে তিনি মূলত কবি বলে ভাবানুতার প্রাধান্য তার মধ্যে বেশি। এ ভাবানুতাকে তিনি বিষয় নির্মাণ ও ভাষার দেহ নির্মাণ উভয় ক্ষেত্রেই দক্ষতার সঙ্গে ব্যবহার করেছেন।

এখানেই শিল্পী হিসাবে তাঁর সার্থকতা। *'বিশ্বনবি'*তে খুব স্বাভাবিকভাবেই আন্তরিক ভক্তিপূর্ণ মনোভাব প্রকাশিত একজন ভক্ত হিসাবেই গ্রন্থে তাঁর এই মনোভাব প্রতিফলিত হয়েছে। ভক্ত কবির আবেগপ্রসূত মনের প্রকাশ শুধু বর্তমান গ্রন্থে নয়, অন্যান্য ক্ষেত্রে লক্ষ্য করা যায়। এই কারণে গ্রন্থটি বাংলা ভাষাভাষি পাঠকদের কাছে বিপুল জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে। গ্রন্থকার দীর্ঘ দিনের পরিশ্রমে মুহাম্মদ (সা.)-এর উপর একটি প্রামাণ্য জীবনী গ্রন্থ উপহার দেন; যার মধ্যে শুধু শুকনো তথ্য নেই, আছে তথ্যের সাহিত্যিক উপস্থাপনা, যুক্তিবাদ ও আবেগ প্রবণ মনোভাবের প্রতিফলন। এই মিশ্রিত বৈশিষ্ট্যের জন্যেই *'বিশ্বনবি'* সমাদৃত একটি গ্রন্থ।[৩০]

'বিশ্বনবি' গদ্যে রচিত। এটা একজন বড় কবির কাজ। আমাকে কেউ যদি প্রশ্ন করে তাঁর শ্রেষ্ঠ কাব্য কি? আমি বলব *'বিশ্বনবি'*। যদিও এটা গদ্যে রচিত তবুও একজন কবির পক্ষে এই মহা-মানবের জীবনী কাব্যিক মহিমায় লেখা সম্ভব হয়েছিল এবং কাব্যময় ভাষায় সেটা প্রকাশ করা হয়।[৩১]

*'বিশ্বনবি'*র ভাষা বৈশিষ্ট্য দু'ভাবে নির্দেশ করা যায়। প্রথম অংশে আবেগ প্রাধান্য পেয়েছে, দ্বিতীয় অংশে আবেগ বর্জিত স্বাভাবিক ও সাবলীল ভাষা প্রকাশ পেয়েছে। উভয় ক্ষেত্রেই লেখকের দক্ষতার জন্যে গ্রন্থটি

পাঠক সমাদৃত হয়। গ্রন্থে যেখানে কাল্পনিক বর্ণনা প্রাধান্য পেয়েছে, সেখানেই ভাষার মধ্যে আবেগ প্রতিফলিত হয়েছে। উদাহরণ স্বরূপ-

প্রথম শ্রেণির ভাষা

> 'শুক্লা-দ্বাদশীর অপূর্ণ চাঁদ সবেমাত্র অস্ত গিয়াছে। সুবহে-সাদিকের সুখনূরে পূর্ব-আসমান রাঙ্গা হইয়া উঠিতেছে। আলো-আঁধারের দোল খাইয়া ঘুমন্ত প্রকৃতি আঁখি মেলিতেছে। বিশ্বপ্রকৃতি আজ নীরব। নিখিল সৃষ্টির অন্তরতলে কি যেন একটি অতৃপ্তি ও অপুর্ণতার বেদনা রহিয়া রহিয়া হিল্লোলিত হইয়া উঠিতেছে। কোন স্বপ্নসাধ আজও যেন তার মিটে নাই। যুগযুগান্তর পুঞ্জীভুত সেই নিরাময় বেদনা আজ যেন জমাট বাঁধিয়া দাঁড়াইয়া আছে।'[৩২]

দ্বিতীয় শ্রেণির ভাষা

'এ জ্বলন্ত বীরবাণী শ্রবণ করিয়া মুসলমানগণ উৎসাহিত হইয়া উঠিলেন। সকল দুর্বলতা মুর্তমধ্যে কোথায় ভাসিয়া গেল। শত্রুর সম্মুখীন হইবার জন্য বীরদল তৎক্ষণাৎ প্রস্তুত হইলেন। মুতা নামক স্থানে উভয় পক্ষ পরস্পরের সম্মুখীন হইল।'[৩৩]

এ সম্পর্কে অধ্যাপক হাসান আবদুল কাইয়ুম লিখেছেন,

আমরা 'বিশ্বনবি' গ্রন্থখানি পাঠ করিলেই দেখতে পাবো এতে যে ভাষায় লালিত্য মেখেছেন তা প্রেমিকের হৃদয় থেকেই কেবল উৎসারিত হতে পারে।'[৩৪]

তবে এখানে বিষ্ময়করভাবে লক্ষণীয় যে, কবিতার আবেগ কখনই গদ্যের মননশীল গাম্ভীর্য এবং যুক্তির ভারসাম্যপূর্ণ সৌন্দর্যকে নষ্ট করেনি; কাব্যের পেলব আমেজ গদ্য শরীরকে ধুয়ে দিয়েছে, পরিছন্ন ও গতিময় করেছে, কিন্তু আবেগের জোয়ারে ভাসিয়ে নিয়ে যায় নি। এ কারণেই *'বিশ্বনবি'* (সা.) কবির আবেগে রচিত এক অনুপম গদ্যগ্রন্থ। কবি লিখেছেন,

'রবিউল আউয়াল মাসের বারো তারিখ। সোমবার ....'

> আরবের মরু-দিগন্তে মক্কা নগরীর এক নিভৃত নিরব কুটিরে একটি নারী ঠিক একই সময়ে সুখস্বপ্ন দেখিতেছিলেন। নাম তাঁর আমিনা। আমিনা দেখিতেছিলেন: এক অপূর্ব নূরে আসমান-যমীন উজালা হইয়া গিয়াছে। সেই আলোকে চন্দ্র সুর্য-গ্রহ তারা ঝলমল করিতেছে। কার যেন আজ শুভাগমন, কার যেন আজ অভিনন্দন। যুগ যুগান্তের প্রতীক্ষিত সেই না আসা অতিথির আগমন মুহুর্ত আজ যেন আসন্ন হইয়া উঠিয়াছে। কুল মাখলুক আজ সেই আনন্দে আত্নহারা। গগণে গগণে ফেরেশতারা ছুটোছুটি করিতেছে,

> তোরণে তোরণে বাঁশি বাজিতেছে। সবাই আজ বিস্মিত পুলকিত কম্পিত শিহরিত। জড় প্রকৃতির অন্তরেও আজ দোলা লাগিয়াছে; খসরণর রাজপ্রসাদের স্বর্ণ-চূড়া ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে; কাবা-মন্দিরের দেব-মূর্তিগুলো ভুলুণ্ঠিত হইয়াছে; সিরিয়ার মরুভূমিতে নহর বহিতেছে।[৩৫]

মহানবি (সা.)-এর শুভাগমনের পূর্ব মুহুর্তে কবি যে চিত্রকল্প এঁকেছেন, তা নিরস-কঠিন ভাষায় সম্ভবপর ছিলো না। শব্দ ও ভাষার ব্যবহার, সংগীতিক ব্যঞ্জনা সৃজন, আবেগের সংযত প্রবহমানতা এবং অসাধারণ চিত্রকল্প বা ইমেজ সৃষ্টির ক্ষেত্রে তিনি এক শক্তিমান কবির ভূমিকা পালন করেছেন এখানে। পরিবেশ-পরিপ্রেক্ষিত এবং বিষয় অনুযায়ী গদ্যশৈলী নির্মাণে গোলাম মোস্তফা অনন্য দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন এই অধ্যায়ে। পরের অধ্যায়ে মহানবি (সা.)-কে কোন দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করতে হবে, তিনি কি 'মানব' না 'মহামানব' এ সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। বিষয়ের প্রকৃতি অনুযায়ী এ অংশের গদ্য ও ছান্দিক দ্যোতনায় ভাস্কর, এখানেও গতিময় প্রবহমানতার অভাব নেই।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ-এ 'প্রতিশ্রুত পয়গম্বর' শিরোনামে বেদ পুরাণ, বৌদ্ধ শাস্ত্র, পাদ্রী ধর্মশাস্ত্র, তওরাত ও বাইবেলে মুহাম্মাদের আগমন সম্পর্কে যে ইঙ্গিত দেয়া হয়েছে সে সম্পর্কে উল্লেখ করেছেন। বেদ, পুরাণ থেকে লেখক যে উদ্ধৃতি দিয়েছেন তা নিম্নরূপ,

'অল্লোপরিষদ' এ একটি স্থানে দেখা যায়
হোতারমিন্দ্রো হোতারমিন্দ্রো মহাসুরিদ্রা
আলো জ্যেষ্ঠং শ্রেষ্ঠং পরমং পর্ণং ব্রক্ষণ আল্লাম।
আল্লোহ রসুল মহম্মাদকং বরস্য অলো অল্লাম।
আদল্লাহবুকমে ককম অল্লাবুক লিখাতকম'।[৩৬]

ভাবার্থ আল্লাহ সকল গুণের অধিকারী। তিনি পূর্ণ ও সর্বজ্ঞানী। মুহাম্মদ আল্লাহ্র রাসূল। আল্লাহ আলোকময়, অক্ষয়, তিনি একটির পরিপূর্ণ এবং স্বয়ম্ভু।'[৩৭]

দিঘা নিকায়া'য়[৩৮] উল্লিখিত হয়েছে, 'মানুষ যখন গৌতম বুদ্ধের ধর্ম ভুলিয়া যাইবে, তখন আর একজন বুদ্ধ আসিবেন, তাঁহার নাম 'মৈত্তেয়' (সংস্কৃত মৈত্তেয়) অর্থাৎ শান্তি ও করুণার বুদ্ধ।'[৩৯]

পার্শী ধর্মশাস্ত্রে[৪০] হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর আবির্ভাবের সুস্পষ্ট ভবিষ্যদ্বাণী রয়েছে। এমনকি আহমাদ নামটি পর্যন্ত উল্লিখিত হয়েছে।

Onoidte Ahmad dragoyeitim fram-raomi Spetame Zarathustra yam dahman vangnim afritim. Yunad hake hahi humananghad havkanghad Hushyanthnad hudaenad.[৪১]

'আমি ঘোষণা করিতেছি, হে স্পিতাম জরথুষ্ট্র, পবিত্র আহমদ (ন্যায়বানদিগের আর্শীবাদ) নিশ্চয়ই আসিবেন, যাহার নিকট হইতে তোমরা সৎ চিন্তা, সৎ বাক্য, সৎ কার্য এবং বিশুদ্ধ ধর্ম লাভ করিবে।'[৪২]

'দসাতির' গ্রন্থেও অনুরূপ আর একটি ভবিষ্যদ্বাণী আছে। যার সারমর্ম-
'যখন পার্শীরা নিজেদের ধর্ম ভুলিয়া গিয়া নৈতিক অধঃপতনের চরম সীমায় উপনীত হইবে, তখন আরবদেশে এক মহাপুরুষ জন্মগ্রহণ করিবেন, যাঁহার শিষ্যরা পারশ্যদেশ এবং দুর্ধর্ষ পারশিক জাতিকে পরাজিত করিবে। নিজেদের মন্দিরে অগ্নিপূজা না করিয়া তাহারা ইব্রাহিমের কাবা ঘরের দিকে মুখ করিয়া প্রার্থনা করিবে; সেই কাবা প্রতিমা মুক্ত হইবে; সেই মহাপুরুষের শিষ্যেরা বিশ্ববাসীর পক্ষে আর্শীবাদ স্বরূপ হইবে।'[৪৩]
ইয়াহুদিদের ধর্মগ্রন্থ 'তওরাতে' ভবিষ্যদ্বাণী আছে,
The Lord thy God will raisep unto thee a Prophet from the midst to thee, of thee brethren, like unto me, Unto him ye shall hearken.[৪৪]
'তোমাদের প্রভু ঈশ্বর তোমাদের ভ্রাতৃদিগের মধ্য হইতে আমার (মূসার) মতই একজন পয়গম্বর উত্থিত করিবেন; তাহার কথা তোমরা মনোযোগ দিয়া শ্রবণ করিবে।'[৪৫]

বাইবেলে যীশুখ্রীষ্ট নিজেও বলেছেন,
If you love me, Keep my commandments. And I will pray the father and he shall give you another comforter that he may abide with you forever.[৪৬]
'যদি তোমরা আমাকে ভালবাস, তবে আমার উপদেশমত কার্য করিও; আমি স্বর্গীয় পিতার নিকট প্রার্থনা করিব, যাহাতে তিনি তোমাদিগকে আর একজন শান্তিদাতা প্রেরণ করেন-যিনি চিরদিন তোমাদের সঙ্গে থাকিতে পারেন।'[৪৭]

আল-কুর'আনুল কারিমে বিভিন্ন স্থানে এ ভবিষ্যদ্বাণী সম্বন্ধে বিভিন্ন প্রসঙ্গের উল্লেখ দেখতে পাওয়া যায়। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

'আর স্মরণ কর, যখন আল্লাহ নবিদের অঙ্গীকার নিয়েছেন, আমি তোমাদেরকে যে কিতাব ও হিকমাত দিয়েছি, অতঃপর, তোমাদের সাথে যা আছে তা সত্যায়নকারীরূপে একজন রাসূল তোমাদের কাছে আসবে, তখন অবশ্যই তোমরা তাঁর প্রতি ঈমান আনবে এবং তাঁকে সাহায্য করবে। তিনি বললেন,

তোমরা কি স্বীকার করেছ এবং এর উপর আমার প্রতিশ্রুতি গ্রহণ করেছ? তারা বলল, আমরা স্বীকার করেছি। আল্লাহ বললেন, তবে তোমরা সাক্ষী থাক এবং আমিও তোমাদের সাথে সাক্ষী রইলাম।'[৪৮]

হযরত মুহম্মদ (সা.) ছিলেন প্রতিশ্রুত পয়গম্বর (Promised Prophet) আল্লাহ যে তাঁকে দুনিয়ায় পাঠাবেন, তা পূর্বেই নির্ধারিত হয়েছিল। প্রত্যেক শিল্পবস্তুই প্রথমে শিল্পীর ধ্যানে জন্মলাভ করে, তার অনেক পরে বাহিরে প্রকাশ পায়। মুহাম্মদ (সা.) সম্বন্ধেও একথা সত্য। তিনি ছিলেন সৃষ্টির কেন্দ্রবিন্দু। কাজেই তাঁর জ্যোতির্মূর্তি আল্লাহর ধ্যানে প্রথমেই সঞ্চারিত হইয়াছিল। এই জ্যোতিমূর্তিই নূরে-মুহাম্মদী। সর্বপ্রথম তাই আল্লাহ সৃষ্টি করিয়াছিলেন মুহাম্মাদের নূর।[৪৯]

কাজেই একথা অনায়াসে বলা যায় যে, হযরত মুহাম্মদ (সা.) তাঁর জন্মের অনেক আগেই জন্মেছিলেন। সকল সৃষ্টি তাঁরই নূরে উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছিল। বিশ্ব-প্রকৃতির অন্তর জুড়িয়া তাই এক পরম কৌতুহল ও জিজ্ঞাসা জাগিয়াছিল: কোথায় কবে কোনখানে কিভাবে নিখিলের সে ধ্যানের ছবি বাহিরে আত্মপ্রকাশ করিবে।[৫০]

প্রতিশ্রুত পয়গম্বরকে এ অর্থেই গ্রহণ করতে হবে। প্রতিশ্রুত পয়গম্বর তিনি-যাঁর আবির্ভাব সৃষ্টির স্বাভাবিক নীতিতে পূর্বেই হয়ে থাকে। সৃষ্টিতত্ত্বের স্বাভাবিক নিয়মে যা অনিবার্য, আবির্ভাবের পূর্বে তাই প্রতিশ্রুত।[৫১]

হযরত মুহাম্মদ (সা.) আসবেন একথা তাই বিশ্ব নিখিলের অবিদিত ছিল না। হযরত আদম (আ.), হযরত নূহ (আ.), হযরত মূসা (আ.), হযরত ইবরাহিম (আ.) হযরত ঈসা (আ.) প্রমুখ। পূর্ববর্তী সকল পয়গম্বর ও তত্ত্বদর্শী মহাপুরুষই জানতেন সে নিশ্চিত অনাগত একদিন আসবে; তাই তারা প্রত্যেকেই হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর আগমন সম্বন্ধে ভবিষ্যদ্বাণী করে গেছেন।

বেদ-পুরাণ, জিন্দাবেস্তা, দিঘা-নিকায়া, তাওরাত, যবুর, বাইবেল প্রভৃতি পুরাকালীন প্রধান প্রধান ধর্মগ্রন্থে মুহাম্মদ (সা.)-এর গুণগান ও তাঁর আগমন সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী বিঘোষিত হয়েছে।

এ সমস্ত ভবিষ্যদ্বাণী থেকে বুঝা যায় যাঁর প্রশংসা এবং আগমনবার্তা বহু পূর্ব থেকেই যুগে যুগে দেশে দেশে ঘোষিত হয়ে আসছে, আল্লাহ যাকে সর্বশ্রেষ্ঠ পয়গম্বর ও সর্বোত্তম আদর্শরূপে দুনিয়ায় পাঠিয়েছেন, তিনি অন্য সকলের মত সাধারণ মানুষ নন। কবি গোলাম মোস্তফা লিখেছেন,

'অতএব হযরত মুহাম্মদ (সা.)-কে আমরা যেন সাধারণ মানুষের পর্যায়ভুক্ত করিয়া বিচার না করি। তাঁহার জীবনে আমরা অনেক সময় অলৌকিক মহিমা প্রকাশ দেখিতে পাইব, তাঁহার অনেক কার্য হয়ত আমাদের কাছে বৈসাদৃশ্য বা অলৌকিক বলিয়া মনে হইবে, কিন্তু সেগুলোকে আমরা যেন ধীরভাবে বুঝিতে চেষ্টা করি।'[৫২]

প্রতিশ্রুত পয়গম্বর, অধ্যায়ের পুঙ্খানুপঙ্খ আলোচনায় কবি গোলাম মোস্তফা দেখাতে চেষ্টা করেছেন যে, হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর আগমন সাধারণ কোনো ঘটনা ছিল না। জগৎ সৃষ্টির উদ্দেশ্য মূলেই ছিল তাঁর সৃষ্টি রহস্য ও তার আগমন।

হযরত মুহাম্মদ (সা.) ৫৭০ খ্রিস্টাব্দের ২৯ আগস্ট, মোতাবেক ১২ রবিউল আউয়াল মাসের সোমবার, সুবেহ সাদেকের সময় ভূমিষ্ঠ হন। হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর আবির্ভাবকালে জগতের ধার্মিক, নৈতিক ও সামাজিক পরিস্থিতি ছিল অন্ধকারময়। আরব, পারস্য, মিশর, রোম, ভারতবর্ষ প্রভৃতি তৎকালীন সভ্য জগতের সর্বত্রই সত্যের আলো নিভে গিয়েছিল। যবুর, তাওরাত, বাইবেল, বেদ প্রভৃতি যাবতীয় ধর্মগ্রন্থই বিকৃত ও রূপান্তরিত হয়ে পড়েছিল, ফলে স্রষ্টাকে ভুলে মানুষ সৃষ্টির পায়েই বারে বারে মাথা নত করছিল। তাওহীদ বা একেশ্বরবাদ জগৎ হতে প্রায় লুপ্ত হয়েছিল; প্রকৃতি পূঁজা; প্রতিমা পূঁজা; প্রতীক পূঁজা, পুরোহিত পূঁজা, অথবা ভূত-প্রেত ও জড়-পূঁজাই ছিল তখনকার দিনে মানুষের প্রধান ধর্ম। রাষ্ট্রীয়, সামাজিক, বা নৈতিক শৃঙ্খলা কোথাও ছিল না। অনাচার, অবিচার, অত্যাচার ও ব্যভিচারে ধরণী পীড়িত হয়ে উঠেছিল। ভারতবর্ষ, চীন, পারস্য, ইয়াহুদি জাতি, খ্রিস্টান জাতি সবখানে যে পাপের স্রোত বয়ে গিয়েছিল তার কোনো তুলনা নেই।

প্রভাতের অরুণ রাঙ্গা আকাশ, মধ্যাহ্নের অগ্নিক্ষরা 'লু' ভরা বাতাস; নিস্তব্ধ নির্জন রাতের ধ্যান-গম্ভীর মৌনতা, দূরে দূরে গিরি উপত্যকার ধূসর শ্রী, মরু-দিগন্তের মায়া-মরীচিকা, সমস্তই তার মনে এক অপূর্ব বিস্ময় ও জিজ্ঞাসার সৃষ্টি করতে লাগল। এ পরিদৃশ্যমান জগতের অন্তরালে যে একজন নিয়ন্ত্রা আছেন, তিনি যে আড়ালে থেকে নানা বর্ণে, নানা গন্ধে ও নানা ছন্দে আপনাকে প্রকাশ করছেন, এ সত্য তিনি তাঁর অন্তর দিয়ে উপলব্ধি করতে লাগলেন। তাই কবি লিখেছেন,

'তিনি যে নিরক্ষর ছিলেন, উম্মি ছিলেন ইহা অত্যন্ত স্বাভাবিকই হইয়াছিল। অসম্পূর্ণ মানুষের অসম্পূর্ণ শিক্ষা গ্রহণ করিলেই তিনি ছোট হইয়া যাইতেন। মানুষের দেওয়া জ্ঞান তাঁহার মনের উপর একটি পর্দার আড়াল টানিয়া দিত; চির জ্যোতির্ময়ের জ্যোতিপুঞ্জ তখন আর প্রত্যক্ষভাবে তাঁহার চিত্তে আসিয়া প্রতিফলিত হইতে পারিত না।'[৫৩]

তিনি অন্যদেরকে পৃথিবীর যে কোনো প্রান্ত থেকে জ্ঞান অর্জনের আদেশ দিয়েছেন। হালিমার গৃহে অবস্থানকালে হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর জীবনে একটি অলৌকিক ঘটনা ঘটেছিল। কবি লিখেছেন,

> 'একদিন শিশু মুহাম্মদ (সা.) তাঁর দুধ-ভাইও অন্যান্য বালকদিগের সহিত মাঠে মেষ চরাইতে গিয়াছেন, এমন সময় একজন ফেরেশতা তাঁহাদের সম্মুখে আবির্ভুত হইলেন। মুহাম্মাদের হাত ধরিয়া তাঁহাকে তিনি একটু আড়ালে লইয়া গেলেন। তারপর তাঁহাকে চিৎ করাইয়া তাঁহার বুক চিরিয়া কি যেন বাহির করিলেন। মুহাম্মদ (সা.) সংজ্ঞাহীন

> অবস্থায় পড়িয়া রহিলেন। দূর হইতে এ ব্যাপার লক্ষ্য করিয়া বালকেরা ভয়ে দৌড়াইয়া গিয়া বিবি হালিমাকে বলিল, দেখ গিয়া মুহাম্মদ (সা.) নিহত হইয়াছে।' সংবাদ শ্রবণমাত্র হালিমা এবং তাহার স্বামী ছুটিয়া আসিলেন। দেখিলেন মুহাম্মদ (সা.) বাস্তবিকই অজ্ঞান অবস্থায় পড়িয়া আছেন। তাঁহারা কিছুই বুঝিতে পরিলেন না। সেবা শুশ্রূষা করিয়া উভয়ে মুহাম্মদকে গৃহে লইয়া আসিলেন।'[৫৪]

গোলাম মোস্তফা তাঁর *'বিশ্বনবি'* গ্রন্থে মুহাম্মদ (সা.)-এর বক্ষ বিদারণের ঘটনাটি বর্ণনা করেছেন। ইব্‌ন হিশাম এবং অন্যান্য ঐতিহাসিকগণও অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। ইব্‌ন হিশাম বলেছেন,

> "হালিমা বলিয়াছেন; মুহাম্মদ (সা.) একদিন তাঁহার দুধ ভাইদের সহিত বাড়ির নিকটে মেষ চড়াইতেছিলেন। এমন সময় বালকেরা ছুটিয়া আসিয়া আমার নিকট বলিল যে, দুইজন শ্বেতবাস পরিহিত লোক আসিয়া তাহাদের কোরাইশ ভাইকে ধরিয়া তাহার বক্ষ বিদীর্ণ করিয়া ফেলিয়াছে। আমি এবং আমার স্বামী তৎক্ষণাৎ ঘটনাস্থলে উপস্থিত হইয়া দেখিলাম, মুহাম্মদ (সা.) বিবর্ণ ও ভীত অবস্থায় পড়িয়া আছে। তখন বালক উত্তর দিল; দু'টি শ্বেতবাস পরিহিত লোক আমার নিকট আসিয়া আমাকে চিৎ করিয়া শোয়াইয়া আমার কলিজা বাহির করিয়া লইল এবং উহার মধ্য হইতে একটা কিছু বাহির করিয়া ফেলিল। সে যে কি জিনিস, আমি জানি না।'[৫৫]

এখানে একটি বিষয় লক্ষণীয়, হার্ট বা অন্য যে কোনো অংগের অপারেশনের বেলায় ক্লোরোফরম বা ঐ জাতীয় কোনো Anaesthetic দিয়ে অনুভূতিকে লোপ করে দিতে হয়। রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর মাধ্যমে প্রায় পনর শত বছর পূর্বেই জগদ্বাসী এই অভিনব চিকিৎসা পদ্ধতির সন্ধান পেয়েছে। ঘটনাটির ব্যাখ্যা যাই হোক, বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যায় এর মূল্য অনস্বীকার্য এবং যুক্তিযুক্ত। বিবি হালিমা শিশু মুহাম্মদ (সা.)-কে আমিনার কোলে ফিরিয়ে দিলেন।

হযরত মুহাম্মদ কোনোদিনই এ দুধ-মা ও দুধ বোনকে ভুলতে পারেন নি। যতদিন হালিমা জীবিত ছিলেন, ততদিন হযরত তাঁদের তত্ত্বাবধান করে গেছেন। হালিমা যখনই হযরতের সঙ্গে দেখা করতে আসতেন, তখনই হযরত পরম শ্রদ্ধাভরে তাঁকে অভ্যর্থনা জানাতেন। যথোপযুক্ত উপহারাদি দিয়ে তাঁকে বিদায় দিতেন। একবার হযরত তাঁর শিষ্যবৃন্দকে নিয়ে বসেছিলেন। এমন সময় হালিমা হযরতের সাথে দেখা করতে এলেন। হযরত তাঁকে দেখামাত্রই আসন হতে উঠে দাঁড়ালেন এবং নিজের শিরস্ত্রাণ বিছিয়ে তাঁকে বসতে দিয়ে সকলের কাছে এ বলে পরিচয় দিলেন, 'মা! আমার মা'!

বিবি খাদীজার সাথে যখন হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর বিয়ে হয় তখন তিনি তাঁর দুধ-মা ও দুধ-বোনকে আনতে ভোলেন নি। আবার একবার যখন আরবে দুর্ভিক্ষ দেখা দিয়েছিল তখন হালিমা হযরতের নিকট

সাহায্য প্রার্থনা করলে তিনি সন্তুষ্টচিত্তে এক উট বোঝাই খাদ্যদ্রব্য এবং চল্লিশটি মেষ তাঁকে পাঠিয়ে দেন। শুধু তাই নয়; কবি গোলাম মোস্তফা লিখেছেন,

'শায়েমার স্মৃতিও হযরত কোনোদিন ভুলিতে পারেন নাই। তায়েফ নগর অবরোধকালে শায়েমা বন্দিনী হন। হযরত তাঁহাকে চিনিতে পারিয়া তৎক্ষণাৎ তাঁহাকে মুক্ত করিয়া দিয়া আপন পরিবারের লোকদিগের নিকট পোঁছাইয়া দেন। শুধু তাহাই নহে, সমস্ত বনি সা'দ গোত্রের প্রতিই চিরদিন তিনি কৃতজ্ঞ ছিলেন।'[৫৬]

একজন মহামানবের পূর্ণ জীবনের সব বিষয়ের-বড় ছোট খুঁটিনাটি দিক যেভাবে কবি গোলাম মোস্তফা বর্ণনা করেছেন, তা কেবল একজন কবির পক্ষেই সম্ভব। একজন কবিই পারেন জীবনের অতলান্ত সত্যকে উপস্থাপন করতে অন্তর্নিহিত আবেগকে ভাষার সুষমায় সিক্ত করতে জীবনের পরতে পরতে সাজাতে। জীবনের দৃশ্যমান দিকগুলোর সাথে অদৃশ্যমান দিকের মিল টানতে, রেখা টানতে ও উপমায় উপমায় চিত্রকল্প আঁকতে। সে দিক দিয়ে কবি গোলাম মোস্তফা কবিতার বেলায় যেমন সার্থক, প্রবন্ধের নিটল গদ্যেও পারঙ্গম।

সুদীর্ঘ পাঁচ বৎসর পর আমিনা আপন দুলালকে কাছে পেয়ে আবার আনন্দ অনুভব করলেন। কিন্তু সে সুখ তাঁর ভাগ্যে বেশিদিন স্থায়ী হয় নি। তাঁর সাধ হল আপন পুত্রকে সাথে নিয়ে তাঁর স্বামীর কবর যিয়ারত করবেন।

কবি গোলাম মোস্তফা হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর বেড়ে উঠা থেকে শুরু করে জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত তাঁর জীবনের সমস্ত ঘটনাই পুঙ্খানুপঙ্খভাবে আলোচনা করেছেন। ওহুদের যুদ্ধে কোরাইশ বাহিনীর কাছে মুসলিম বাহিনী পরাজিত হয়। গোলাম মোস্তফা বলেছেন, এ ক্ষণিকের পরাজয় সামগ্রিক পরাজয় নয় এটা বিজয়ের অন্যরূপ। চমৎকার তার এই বিশ্লেষণ। বিশ্লেষণের মাধ্যমে যুক্তিকে প্রতিষ্ঠিত করার প্রচেষ্টা কত পরিশ্রমধর্মী এটি অন্যতম প্রমাণ।

যুক্তিগুলোকে তিনি আল-কুর'আনের উদ্ধৃতি দিয়ে কুর'আন ও উক্ত বক্তব্যের সাথে মিলিয়ে দিয়েছেন। সাময়িক বিপর্যয় ও পরাজয় যে সত্যিকার পরাজয় নয় বরং ভবিষ্যৎ বিজয়ের ভিত এটাই সত্য। মদ হারাম হওয়া সম্পর্কে লিখিত পরিচ্ছেদ বিষয়ের গভীরে যাওয়ার যে চিত্তবৃত্তি বা মেধার তীক্ষ্ণতা তার পরিচয় পাওয়া যায় এই পরিচ্ছেদে। বিজ্ঞানকে ব্যবহার করে রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর চরিত্র বিশ্লেষণের এটিই বোধ হয় প্রথম প্রচেষ্টা। এখানে নিঃসন্দেহে তিনি মনীষীর পরিচয় দিয়েছেন।

গোলাম মোস্তফার *‘বিশ্বনবি’* দুখণ্ডের প্রথম খণ্ডে তিনি রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর জীবনের ঐতিহাসিক ঘটনার বর্ণনা দিয়েছেন। দ্বিতীয় খণ্ডে তিনি মহাপুরুষদের মানব শ্রেষ্ঠ ও নবি শ্রেষ্ঠ রূপে প্রমাণ করেছেন। দ্বিতীয় খণ্ডের ভূমিকায় তিনি লিখেছেন,

> ‘হযরত মুহাম্মদকে আমরা শুধু ‘মানুষ’ও বলি নাই মহা-মানবও বলি নাই। তিনি আমাদের মতই একজন মাটির মানুষ ছিলেন ইহাও যেমন ভুল ধারণা; পক্ষান্তরে যদি বলি যে তিনি মানুষ ছিলেন না, অথবা কোন অলৌকিক ব্যক্তিত্ব তাঁর ছিল না, সে ধারণাও ভুল। মানব এবং মহামানবের তিনি ছিলেন সমন্বয়ক। ইহাই তাহার বৈশিষ্ট্য। কিন্তু ইসলামের আলোকে রাসূলুল্লাহ (সা.) এই দ্বৈতরূপ নির্ভুল হইবে না। ইসলাম অতি মানবতার বদলে (দেবত্ববাদকে) অস্বীকার করে। সাধারণ জ্ঞানে যাহা অতিমানবতা বলিয়া মনে হয়, ইসলামের দৃষ্টিতে তাহাও মানবতা। তথাকথিত অতিমানবতা মানবতারই পূর্ণরূপ। কাজেই দেবত্বের বা অতিমানবতার কোন প্রয়োজনই ইসলাম স্বীকার করে না। ইসলাম বলে, আল্লাহর আরশের নিচেই মানুষের স্থান। জ্ঞানে-গুণে, শক্তি ও সম্ভাবনায় মানুষ আল্লাহর প্রতিনিধি। আল্লাহ এবং মানুষের মধ্যে তৃতীয় কোন শক্তি না।’[৫৭]

এখানে কবি মৌলিক কথা লিখেছেন। কিংবা তিনি ইসলামের একটি মৌলিক ধারণাকে ব্যাখ্যা করেছেন। মানুষ সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ জীব। যে মানুষকে ফেরেশতারা পর্যন্ত সিজদা করেছে আল্লাহর হুকুমে তাঁর শ্রেষ্ঠত্ব সম্বন্ধে আর সন্দেহ করার কোনো কারণ নেই। কিন্তু মানুষ শ্রেষ্ঠ হলেই কি সব মানুষ শ্রেষ্ঠ হয়। যে মানুষ বুদ্ধিতে নিকৃষ্ট, প্রবৃত্তির শিকার, লোভের দাস সেও কি সেই মানুষ যাকে ফিরিশতারা সিজদা করতে পারে? বুদ্ধি জ্ঞান ও মেধায় এক মানুষ অন্য মানুষের চেয়ে যেমন নিকৃষ্ট এবং ক্ষুদ্র তেমনি এক মানুষ অন্য মানুষের চেয়ে উৎকৃষ্ট ও বৃহৎ। রাসূলুল্লাহ্ (সা.) তাঁর সমগ্র জীবনে বিরুদ্ধ শক্তির বিরুদ্ধে বা অকল্পনীয় প্রতিকুলতার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে ইসলামকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন, যে কোনো সামান্য মানুষের কল্পনায় তা বিষ্ময়। তাই অতিমানবতাবাদকে স্বীকার না করেও তাঁকে মহামানব বা অতিমানব বলা কেন অন্যায় হবে আর তিনি তো শুধু মানব শ্রেষ্ঠ নন, তিনি নবিদের মধ্যেও শ্রেষ্ঠ। কবি গোলাম মোস্তফা বলেছেন,

‘সাধারণ জ্ঞানে যাহা অতি মানবতা বলিয়া মনে হয়, ইসলামের দৃষ্টিতে তাহা মানবতা। তথাকথিত অতি মানবতা মানবতারই পূর্ণরূপ।’[৫৮]

এটি ইসলামি জীবনাধারার কথা। এর যুক্তিও অকাট্য। কিন্তু মানুষে মানুষে যে পার্থক্য আছে, চিন্তা, বুদ্ধি, জ্ঞান, মেধা ও কল্পনাশক্তির, সৃষ্টিশক্তি ও আবিষ্কারশক্তির সমতার যে পার্থক্য সেটা পার্থক্যের

বিচারে অলৌকিকতার প্রশ্ন এসে যায়। কবি গোলাম মোস্তফা সেটা মানেন এবং জানেন। তিনি মহানবি (সা.)-এর শ্রেষ্ঠত্ব সম্পর্কে সন্দেহাতীতভাবে বিভিন্ন প্রমাণ উপস্থাপন করেছেন।

এ প্রমাণ উপস্থাপনের জন্য তিনি মেধা, নিষ্ঠা এবং গভীর আন্তরিকতা, অধ্যবসায়, শ্রম সহকারে বুদ্ধ, যিশু খ্রিস্ট এবং অন্যান্য নবি, মনীষী ও মহাপুরুষদের সঙ্গে তুলনামূলক বিচার করেছেন। তিনি সেই বিচারে রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-কে শ্রেষ্ঠ হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। তিনি লিখেছেন,

'হযরত মুহাম্মদ (সা.)-কে আমরা শ্রেষ্ঠ মানব বলিয়া দাবি করিলাম। যুক্তিজ্ঞান ও শাস্ত্রীয় প্রমাণাদিও দেখাইলাম। কিন্তু তিনি তো কল্পনার মানুষ নহেন, ঐতিহাসিক ব্যক্তি; কাজেই ইতিহাসের কষ্টিপাথরে ইহা কি না, তাহাও আমাদের দেখা উচিত।'[৫৯]

অপর স্থানে লিখেছেন,

'সেই পরীক্ষায় তিনি হযরত মুহাম্মদ (সা.)-কে উত্তীর্ণ করার লক্ষ্যে তিনি হযরত আদম (আ.), হযরত নূহ (আ.), হযরত ইবরাহিম (আ.), হযরত মূসা (আ.), হযরত ঈসা (আ.) অন্যদিকে মহাত্মা বুদ্ধ, রামচন্দ্র, শ্রীকৃষ্ণ, জোরেষ্টার, কনফুসিয়াস, সক্রেটিস প্রমুখ মনীষীদের জীবনী আলোচনা করেছেন এবং বলেছেন, "তাহাদের একজনও হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর মত পরিপূর্ণ নহেন।'[৬০]

তিনি এর অন্যতম প্রধান কারণ হিসেবে বলেছেন, 'তাঁর সমকক্ষতার প্রতিদ্বন্দ্বী পুরুষদের পূর্ণ পরিচয়ও ইতিহাসে লিপিবদ্ধ নেই। অথচ হযরত মুহাম্মদ (সা.) একজন খাঁটি ঐতিহাসিক ব্যক্তি।' তিনি আরও বলেছেন, জীবনের প্রতিস্তরে; প্রতি পদক্ষেপে আমরা যে সব সমস্যার সম্মুখীন হই, তার সবগুলো সমাধান দেখিতে পাই এই আদর্শ মহাপুরুষের মধ্যে। যে কোনো অবস্থায় আমরা তাঁহার মধ্যে খুঁজিয়া পাই আমাদের জিজ্ঞাসার উত্তর। কিন্তু হযরতের পূর্ববর্তী মহাপুরুষদিগের মধ্যে জিজ্ঞাসার উত্তর নাই। মানব জীবনের কোনো কোনো সমস্যার সমাধান তাঁহারা করিয়া গিয়াছেন, অথবা কোনো কোনো বিষয়ে নির্দেশ দিয়াছেন বটে, কিন্তু গোটা মানব সমাজের পথ প্রদর্শক বা আদর্শরূপে তাঁহাদের কাহাকেও আমরা দেখিতে পাই না, অমুসলমানদের দৃষ্টিতে গোলাম মোস্তফার বক্তব্যকে Critical analysis bq Critical appreciation বলে মনে হবে। কিন্তু তাঁর Critical appreciation-কে অযৌক্তিক বলে উপেক্ষা করা কঠিন। তাঁর আলোচনা Comparative বা তুলনামূলক আলোচনা। তুলনামূলক আলোচনা করতে গেলে শব্দের সঙ্গে সে তুলনা করা হবে তাদের নাড়ি নক্ষত্র জেনে তা করতে হবে। আলোচনার মধ্যে কি কি বিষয় আসা প্রয়োজন সেটা বলতে তিনি ভোলেন নি।[৬১] তিনি লিখেছেন,

> 'কে কেমনভাবে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, কেমনভাবে শিক্ষালাভ করিয়াছিলেন, কেমনভাবে বিবাহ করিয়াছিলেন, কেমনভাবে ঘর-সংসার পাতিয়াছিলেন, কেমনভাবে প্রতিবেশিদের সহিত কর্তব্য পালন করিয়াছিলেন। কেমনভাবে রাজ্য পরিচালনা করিয়াছিলেন। কেমনভাবে যুদ্ধ করিয়া দেশ জয় করিয়াছিলেন, স্ত্রী পুত্র পরিজনের প্রতি

কেমনভাবে আচরণ করিয়াছিলেন, নারীকে কতখানি মর্যাদা দিয়াছিলেন, দাস-দাসীদের সহিত কি রূপ ব্যবহার করিয়াছিলেন, জীবন ও জগতকে তাহারা কি কি চোখে দেখিতেন, কেমনভাবে তাহারা জাতি গঠন করিয়াছিলেন, জীবন ও জগতকে তাহারা কোনো চোখে দেখিতেন, কেমনভাবে তাহারা জাতি গঠন করিয়াছিলেন।'

জীবন ও জগতকে তারা কি কি চোখে দেখতেন, কেমনভাবে তারা জাতি গঠন করেছিলেন, নৈতিক ও আধ্যাতিক জীবন তাদের কেমন ছিল, যুগ সমস্যার সমাধান তাঁরা করতে পেরেছিলেন কিনা? বিশ্ব মানবের প্রতি তাঁরা কোনো বাণী দান করে গেছেন কিনা? ইত্যাদি দিক বিচার করতে গেলে তাঁদের প্রত্যেকের মধ্যেই কোনো না কোনো অভাব বা ত্রুটি দেখতে পাওয়া যাবেই। হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর ন্যায় অত সুস্পষ্ট জীবন তাঁদের কারও ছিল না। দয়া, ক্ষমা, দান মহত্ব, জ্ঞানানুরাগ; ত্যাগ, সেবা, প্রীতি, প্রেম, ভালবাসা, উদারতা ইত্যাদি গুণেরই বিকাশ দেখতে পাই আমরা হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর জীবনে।[৬২]

গোলাম মোস্তফা তাঁর *'বিশ্বনবি'* গ্রন্থে প্রত্যেকের জীবনী উদ্ধৃত করে বিস্তারিত আলোচনা করে যেতে পারেন নি। তিনি লিখেছেন,

'এ সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা করা আমাদের এখানে সম্ভব হইল না। পাঠককে আমরা আলোচনার সূত্রটি ধরাইয়া দিলাম মাত্র। পাঠক ইচ্ছা করিলে উপরোক্ত মহাপুরুষদিগের প্রত্যেককে হযরত মুহাম্মদ (সা.) পার্শ্বে আনিয়া এক একটি দিক দিয়া মিলাইয়া দেখিতে পারেন, তারপর তাহার ফলাফল একত্র করিয়া হযরতের মূল্য নির্ধারণ করিতে পারে।'[৬৩]

তিনি একুশটি বিচার বিন্দু রচনা করেছেন। এই বিচার বিন্দুগুলোর মধ্যে তিনি একটি মাত্র তুলনামূলক আলোচনা বুদ্ধ ও মুহাম্মদ (সা.)-এর জীবন ও চরিত্র। এ আলোচনায় তিনি তাঁর বিজ্ঞান দৃষ্টির প্রতিফলন ঘটিয়েছেন। বিচার বিন্দুর এ একুশটি পয়েন্ট তিনি পুঙ্খানুপঙ্খভাবে আলোচনা শেষে লিখেছেন,

'বস্তুত আমাদের দাবি এই যে, হযরত মুহাম্মদ (সা.) তাঁহার পূর্ববর্তী সমুদয় মহাপুরুষদিগের অপেক্ষা সর্ব বিষয়ে শ্রেষ্ঠ ছিলেন। যাহারা এই দাবি মানিবেন না, তাহারা তাঁহাদের নিজেদের দাবি পেশ করুন এবং প্রমাণ করিয়া দেখান যে, তাঁহাদের নিজেদের মনোনীত মহাপুরুষই হযরত মুহাম্মদ (সা.) অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর। এই প্রমাণের দায়িত্ব আমাদের নহে, তাঁহাদের। সৃষ্টির আদিকাল হইতে হযরত মুহাম্মাদের সময় পর্যন্ত যত মহাপুরুষ জন্মিয়াছেন, তাঁহাদের সকলকেই আমরা মোটামুটিভাবে পরীক্ষা করিলাম এবং দেখিলাম, তুলনায় তাহাদের কেহই হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর সমকক্ষ অথবা তদপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ছিলেন না। তিনিই শ্রেষ্ঠদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ছিলেন।'[৬৪]

হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর বিশ্বজনীনরূপ সম্পর্কে কবি গোলাম মোস্তফা লিখেছেন,

'সর্বপ্রথমেই আমাদের দৃষ্টি পড়ে হযরতের বিশ্বজনীনরূপের প্রতি। এমন সর্বগুণ সমন্বিত অসাধারণ ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন মহামানব বিশ্বজগতে আর দ্বিতীয়টি নেই। হযরত মুহাম্মদ (সা.) যে কেবলমাত্র মানুষের জন্য পূর্ণ আদর্শ ছিলেন, তাহা নহে; সমগ্র সৃষ্টির জন্যই তিনি ছিলেন চিরন্তন আদর্শ। জড়জগৎ, উদ্ভিদজগৎ, প্রাণীজগৎ, মানবজগৎ, অধ্যাত্মজগৎ, সৌরজগৎ, ফেরেশতাজগৎ ইত্যাদি মিলিয়া যে বিশ্বজগৎ সেই বিশ্বজগতরই তিনি আদর্শ।'[৬৫]
হযরত মুহাম্মদ (সা.) সমগ্র সৃষ্টির একমাত্র প্রতিনিধি। তাঁর মধ্যে সকলেই নিজ নিজ আদর্শ ও প্রেরণা খুঁজে পেতে পারে। তাঁর জন্ম হতে মৃত্যু পর্যন্ত তাঁকে কেন্দ্র করে যত ঘটনা ঘটেছে সমস্ত কিছু মিলিয়ে দেখা যাবে নিখিল সৃষ্টি তারমধ্যে প্রতিবিম্বিত। পৃথিবীর ধুলিকণা হতে আরম্ভ করে আল্লাহর আরশ পর্যন্ত সপ্ত আসমানের সর্বত্র ছিল তাঁর কর্মভূমি।

'*বিশ্বনবি*'র পর্বে লেখক বিভিন্ন যুক্তির মাধ্যমে কাবার নির্মাণকাল, ইসলাম ও পৌত্তলিকতা, ইসলাম ও মুজিযা, ইসলাম ও নতুন বিজ্ঞান, হযরতের বহুবিবাহের তাৎপর্য ইত্যাদি বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। আলোচ্য বিষয়ের পক্ষে লেখকের পক্ষপাত আছে, কিন্তু অন্ধভাবে গ্রহণের প্রবণতা নেই। প্রসঙ্গক্রমে এখানে ইসলাম ও পৌত্তলিকতা' অধ্যায় থেকে একটি অংশ উদ্ধৃতি করা যায়।

'সত্যিকার মানুষ হইতে হইলে এবং আমাদের অন্তর্নিহিত সুপ্ত শক্তির সম্যক পরিস্ফুরণ করিয়া তুলিতে হইলে আমাদের সর্বপ্রথম প্রয়োজন এই অনন্ত অসীম এবং অদ্বিতীয় আল্লাহকে জীবনের মধ্যে বরণ করিয়া লওয়া এবং তাঁহার সহিত আত্মার নিবিড় যোগাযোগ স্থাপন করা; উন্নত মস্তিকে উদাত্তকণ্ঠে ঘোষণা করা; আমি মানুষ, আমার চেয়ে দেবতা বড় নহে, দেবতার চেয়ে আমি বড়। অসীম অনন্ত ও বিরোধের সহিত সম্বন্ধ স্থাপন না করিলে কেমন করিয়া মানুষ বড় হইবে?'[৬৬]

গোলাম মোস্তফা বিদগ্ধ বিশ্লেষকের দৃষ্টি নিয়ে রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর জীবন চরিত্রের মূল্যায়নের চেষ্টা করেছেন। 'জয় না পরাজয়'-এখানে তিনি রাসূল (সা.)-এর পক্ষ নিয়ে যে কথা বলেছেন সেটা সুস্পষ্ট; কিন্তু যুক্তিযুদ্ধ বুদ্ধি দিয়ে তিনি তার সমর্থন করেছেন। এ যুক্তিকে অটুট ভিত্তি দিতে সমর্থনপুষ্ট নির্ভুল তথ্য দিয়ে তিনি সমস্ত মনোযোগ আকর্ষণ করেছেন।

রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর জীবনে মি'রাজ একটি বিস্ময়কর ঘটনা। এটাকে অনেকে এমনকি মুক্তবুদ্ধিবাদী মুসলিমরাও প্রতীক বলে ব্যাখ্যা করছেন। গোলাম মোস্তফা এটাকে বাস্তব সত্য বলে প্রমাণ করার চেষ্টা করেছেন। এ উপলক্ষে '*বিশ্বনবি*'তে ইসলাম ও মু'জিযা, স্বাভাবিক ও অস্বাভাবিক, স্বাভাবিক ও অতি স্বাভাবিক, বিজ্ঞান আজ কোন্ পথে ইসলাম ও নতুন বিজ্ঞান' 'মি'রাজ' এবং 'ফিলসফি ও মি'রাজ' এ সাতটি গবেষণাধর্মী বিশ্লেষণমূলক ও ব্যাখ্যামূলক প্রবন্ধ লিখেছেন। এ সম্পর্কে দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফ লিখেছেন,

'আমাদের ছেলেবেলায় আমরা গোলাম মোস্তফাকে আমাদের মুসলিম সমাজের একমাত্র জাতীয় কবি বলে শ্রদ্ধা করতাম। ইসলাম ধর্মের প্রতি এবং প্রিয় রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর প্রতি ছিল তাঁর অপরিসীম শ্রদ্ধা। এজন্য কবি নজরুল ইসলামের বিশ্ববিখ্যাত কবিতা 'বিদ্রোহী'র বিরুদ্ধে তিনি অপর একটি কবিতাও লিখেছিলেন। এ ক্ষেত্রে তাঁর সহযোগী ছিলেন প্রিন্সিপ্যাল ইবরাহিম খাঁ। নজরুলের নিকট তাঁর সে পত্রে বিশেষভাবে প্রকাশ পেয়েছে। কবি জীবনের সূচনা থেকেই তিনি মুসলিম সমাজের নানা দুঃখ দুর্দশার চিত্র অংকিত করেছেন এবং সমগ্র বিশ্বে মুসলিম জীবনে যে অধোগতি দেখা দিয়েছে তাতে তার অন্তর ব্যথিত হয়েছে। ভাঙ্গা বুক নামক গল্পে তার পরিচয় সুস্পষ্ট। তবে তাঁর জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ সফলতা দেখা দিয়েছে *'বিশ্বনবি'* নামক রাসূলুল্লাহ্ (সা.) জীবন চরিত্র লেখায়। এতে মাওলানা মোহাম্মাদ আকরম খাঁ কর্তৃক মোস্তফা হযরত রাসুলে আকরম (সা.)-এর মি'রাজকে অস্বীকার করে যে সব উক্তি করা হয়েছে তার তীব্র প্রতিবাদ করা হয়েছে। এতে তিনি আধুনিক বিজ্ঞানের আশ্রয়ে তা প্রমাণের চেষ্টা করেছেন। হযরতের জীবনী সম্বন্ধে বাংলা, ইংরেজি বা অন্যান্য ভাষায় যে সব গ্রন্থ এ যাবত লিখিত ও প্রকাশিত হয়েছে তার মধ্যে এ গ্রন্থখানা শীর্ষস্থানীয় বলে গণ্য হয়েছে।'[৬৭]

'বিশ্বনবি' গ্রন্থ সম্পর্কে মণীষীগণের অভিমত

১. ফুরফুরা শরীফের পীর কেবলা জনাব মাওলানা আবু নসর মুহাম্মদ আব্দুল হাই বলেন,

'কবি মৌলভী গোলাম মোস্তফা সাহেবের লিখিত হুজুরের (সা.) জীবনী *'বিশ্বনবি'* পড়িয়া অত্যন্ত আনন্দিত হইলাম। উহার ভাব, ভাষা ও দার্শনিকতা, কোরআন ও হাদিস শরীফ এবং তাছাউফের সম্পূর্ণ অনুকূল ও ছুন্নাতুল জামায়েতের আকায়েক মোয়াকফ। যাঁহারা বাংলা ভাষায় হযরত রসূলে করিমের (সা.) সঠিক জীবনী ও সত্যস্বরূপ জানিতে চাহেন, তাহাদিগকে *'বিশ্বনবি'* পাঠ করিতে অনুরোধ করি।'[৬৮]

২. ভাষাবিদ ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ বলেন,

'মৌলভী গোলাম মোস্তফা কবিরূপে সুপরিচিত। তাঁহার সব অবদান *'বিশ্বনবি'*। বলা বাহুল্য, ইহা *'বিশ্বনবি'* হযরত মুহাম্মদের (সা.) একটি সুচিন্তিত প্রায় ৫০০ পৃষ্ঠাব্যাপী জীবনচরিত। এই গ্রন্থকার আঁ-হযরত সম্বন্ধে তাঁহার দীর্ঘকালের গভীর চিন্তা ও গবেষণার সুষ্ঠু পরিচয় দিয়াছেন। আমরা এই পুস্তকখানিতে গোলাম মোস্তফা সাহেবকে একজন মোস্তফা-ভক্ত দার্শনিক ও ভাবুকরূপে পাইয়া বিস্মিত ও মুগ্ধ হইয়াছি। ভাষা, তথ্য ও দার্শনিকতার দিক হইতে গ্রন্থখানি অতুলনীয় হইয়াছে।'[৬৯]

৩. শাহাবুদ্দীন আহমদ লিখেছেন,

'বাংলা সহিত্যে যতগুলি জনপ্রিয় গ্রন্থ আছে তার মধ্যে অন্যতম গোলাম মোস্তফার *'বিশ্বনবি'* জীবনীগ্রন্থ হিসাবে এর অনন্যতা অস্বীকার করার মত নয়। খুব সাধারণ পাঠকের কাছে শুধু এই গ্রন্থ জনপ্রিয় নয়, যারা মুসলমান তাদের কাছে এই গ্রন্থ জনপ্রিয় নয়; এ গ্রন্থ জনপ্রিয় বুদ্ধিজীবী, সুধী ও পণ্ডিত বোদ্ধাদের কাছেও। এর কারণ বইটি একটি সুপরিকল্পিত ছাঁচে ঢেলে সৃষ্টি করা হয়েছে। আর রাসূল (সা.)-এর জীবন ও চরিত্র নিয়ে সন্দেহ ভিত্তিক প্রতিটি প্রশ্নের যুক্তিভিত্তিক উত্তর দিয়ে রসূল (সা.)-এর মহত্ত্ব ও শ্রেষ্ঠত্বকে প্রমাণ করার চেষ্টা করা হয়েছে।'[৭০]

গবেষণা প্রবন্ধের ফলাফল

গোলাম মোস্তফা বাংলাদেশের একজন বিখ্যাত কবি ও সাহিত্যিক হিসেবে পরিচিত। তিনি বহু সংখ্যক কবিতা ও সাহিত্যকর্ম সম্পাদন করে এদেশের আপামর সাহিত্যিক প্রেমিকদের হৃদয়ে অবস্থান করে নিয়েছেন। তাঁর কবিতা ও সাহিত্যে ইসলামি ভাবধারায় রচিত। তাঁর রচিত *'বিশ্বনবি'* একটি অনবদ্য রচনা। উক্ত গ্রন্থটির তাত্ত্বিক পর্যালোচনার মাধ্যমে নিম্নোক্ত ফলাফল লক্ষ করা যায়-

১. গোলাম মোস্তফা আমাদের কাছে যেমন কবি হিসেবে পরিচিত, তেমনি *'বিশ্বনবী'* গ্রন্থের লেখক হিসেবে আপামর জনসাধারণের নিকট আরও বেশি পরিচিত ও জনপ্রিয়।

২. কবির রচিত *'বিশ্বনবী'* অপূর্ব ভাষাছন্দে বাংলা সাহিত্যে এক অক্ষয় সংযোজন। তাঁর অন্যান্য রচনার কথা অনেকে জানলেও রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর জীবনী গ্রন্থ *'বিশ্বনবী'* তাঁকে যুগ যুগ ধরে বাংলা ভাষাভাষি পাঠকদের হৃদয়ের সিংহাসনে যুগশ্রেষ্ঠ বাউলের বীণার সুরে অক্ষুন্ন স্মরণ করিয়ে দেয়।

৩. *'বিশ্বনবী'* রচনা করতে গিয়ে কবি গোলাম মোস্তফা বহু সংখ্যক গ্রন্থ থেকে উৎস গ্রহণ করেছেন। যা দ্বারা বুঝা যায় যে, তিনি শুধুমাত্র মনের আবেগে *'বিশ্বনবী'* গ্রন্থটি রচনা করেন নি। তিনি গ্রন্থটি রচনায় আরবি, উর্দু ও ইংরেজি ভাষায় প্রণীত গ্রন্থাবলি থেকে তথ্যসমূহ গ্রহণ করেন। যার কারণে সর্বসাধারণের নিকট গ্রন্থটি সমাদৃত হয়েছে।

৪. *'বিশ্বনবী'* গ্রন্থটি সম্পর্কে কবির সমসাময়িক যুগের কবি ও সাহিত্যিকবৃন্দ প্রশংসামূলক মন্তব্য করেছেন। যা *'বিশ্বনবী'র* গ্রহণযোগ্যতা পাঠক মহলে প্রশংসিত হয়েছে।

৫. সর্বোপরি বলা যায় যে, প্রবন্ধটি পাঠে এ ফলাফল লাভ করতে পারি যে, কবি গোলাম মোস্তফার পরিচিত ও তাঁর রচিত গ্রন্থাবলি সম্পর্কে পাঠক মহল একটি সুদৃঢ় জ্ঞান লাভ করতে পারবে। সাথে সাথে তাঁর রচিত *'বিশ্বনবি'* পাঠে সর্বসাধরণ রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর জীবনের বিভিন্ন দিকগুলো অনুধাবন করতে পারবেন। আমাদের জীবনে রাসূলের জীবন চরিতের আদর্শগুলো বাস্তবায়ন করার উদ্দেশ্যেই *'বিশ্বনবি'* গ্রন্থটি সকলের জন্য পাঠ করার মধ্যেই কল্যাণ নিহিত রয়েছে।

উপসংহার

কবি গোলাম মোস্তফা *'বিশ্বনবি'* রচনায় একটি নতুন যুগের প্রতিনিধিত্ব করেছেন। মুসলিমগণকে নতুনভাবে জেগে উঠতে সাহায্য সহযোগিতা করেছেন। সময়ের দাবীকে পুঙ্খানুপুঙ্খ পালন করেছেন এবং ঐতিহাসিকগণের দৃষ্টিতে ইতিহাসকে ধারণ করেছেন একজন কবির সমস্ত সত্ত্বায়। এর আগেও বাংলা সাহিত্যে হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর জীবনী লিখে বিখ্যাত হয়েছিলেন শেখ আব্দুর রহিম এবং মাওলানা আকরম খাঁ। কিন্তু কবি গোলাম মোস্তফার *'বিশ্বনবি'* সমাজের প্রতিটি শ্রেণির কাছে গ্রহণযোগ্যতা পেয়েছে, মানুষের মাঝে এক ধরনের আলোড়ন সৃষ্টি করেছে তার কাব্যিকতায় সহজতর এবং গবেষণালব্ধ জ্ঞান ও প্রজ্ঞার প্রকাশ ঘটেছে, ইতোপূর্বে সেভাবে কেউই হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর জীবনী লিখে মানুষের হৃদয়ের অন্তস্তলে সাড়া জাগাতে পরেনি। মানুষের ঠোঁটের ভাষায়, হাতের কাছে, জীবনের প্রত্যহিকতায় মিলে মিশে একাকার হতে পারে নি। তাই এ গ্রন্থ প্রকাশের সত্তর বছর পার হলেও এর চির নতুন সুবাস আজও মুসলিমসহ সমগ্র জাতিকে এক নতুন স্রোতে উদ্বেলিত করে, পাঠক সমাজে প্রতিদিনের পাঠ্যসূচিতে পরিণত হয়ে উঠেছে। এ বিখ্যাত গ্রন্থের লেখক কবি গোলাম মোস্তফা হয়ে উঠুক প্রত্যেকের নিজের কবি, হৃদয়ের কবি এবং ঐতিহ্যের ধারক ও বাহক।

টীকা ও তথ্যনির্দেশ

১ ড. মুহম্মদ মজিরউদ্দীন, *বাংলা সাহিত্যে রসুল চরিত* (ঢাকা : বাংলা একাডেমি, ১৯৯৩ খ্রি.), পৃ. ১৩৫-১৩৬

২ ইউকিপিডিয়াতে বলা হয়েছে, He Was Born in 1897, in the village of Monoharpur in Shailkupa thana, Jessore district (now Jhenaidah), in present-day Bangladesh.
"তিনি ১৮৯৭ সালে বাংলাদেশের যশোর জেলার (বর্তমানে ঝিনাইদহ) শৈলকূপা থানার অন্তর্গত মনোহরপুর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন।"

৩ মাহফুজা খাতুন সম্পাদিত, *গোলাম মোস্তফা সংকলন* (ঢাকা : পআহমদ পাবলিশিং হাউস, ১৯৬৮ খ্রি.), পৃ. ৪৬; নাসির হেলাল, *জাতীয় জাগরণের কবি গোলাম মোস্তফা* (ঢাকা : সুহৃদ প্রকাশন, প্রথম প্রকাশ, ১৯৯৮ খ্রি./১৪০৫ ব.), পৃ. ৯; পরবর্তী উৎস হিসেবে নাসির হেলাল, 'কবি গোলাম মোস্তফা' শিরোনামে ব্যবহৃত হয়েছে।

৪ নাসির হেলাল, *জাতীয় জাগরণের কবি গোলাম মোস্তফা*, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৩

৫ উইকিপিডিয়াতে বলা হয়েছে, Mustafa finished his primary education in Damukdia and passed the Entrance exam in 1913 from Shailkupa high school.
Cf. *Poet Golam Mustafa's ancestral house in ruins: 50th death anniversary observe*, The Financial Express. 14 October 2014. *Retrieved 12 December 2014*

৬ গোলাম মোস্তফা, *মোস্তফা সমগ্র*, খ. ১, পৃ. ১২

৭ সম্পাদিত, *ইসলামী বিশ্বকোষ* (ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৯১ খ্রি.), খ. ১০, পৃ. ৬০৯

৮ *পূর্বোক্ত*; উইকিপিডিয়াতে বলা হয়েছে, He passed BA from Ripon College in 1918 and BT from David Hare Training College in 1922.

৯ ফিরোজা খাতুন, কবি গোলাম মোস্তফা সংগ্রহ ও সম্পাদনা, মুনির চৌধুরী, 'কবির চিন্তাধারা ও গদ্যরীতি' (ঢাকা: বাংলা একাডেমি, ১৯৬৭ খ্রি.), পৃ. ৮৭

১০ মাহ্ফুজা খাতুন সম্পাদিত, গোলাম মোস্তফা প্রবন্ধ সংকলন, 'আমার জীবন স্মৃতি', পৃ. ১৩০

১১ ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ, *স্মৃতি ও অবদান*, পূর্বোক্ত, পৃ . ১০

১২ নাসির হেলাল, *বাংলা ভাষায় সীরাত বিষয়ক গ্রন্থপঞ্জি* (ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ), পৃ. ২৭-২৮

১৩ গোলাম মোস্তফা, *বিশ্বনবি* (ঢাকা: আহমদ পাবলিশিং হাউস, দ্বিতীয় সংস্করণ, ১৯৪৬ খ্রি.), পৃ. ভূমিকা

১৪ পূর্বোক্ত।

১৫ পূর্বোক্ত।

১৬ পূর্বোক্ত।

১৭ পূর্বোক্ত।

১৮ শেখ আবদুর রহিম সাংবাদিক ও সাহিত্যিক। তিনি ১৮৫৯ সালে পশ্চিমবঙ্গের চব্বিশ পরগনা জেলার বসিরহাট মহকুমার অন্তর্গত মুহম্মদপুর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। আবদুর রহিম ইসলামি শিক্ষা ও আদর্শ সম্পর্কে বহু সংখ্যক গ্রন্থ রচনা করেন। তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি হলো: হজরত মহম্মদের জীবনচরিত ও ধর্মনীতি (১৮৮৮), ইসলামতত্ত্ব (১৮৯৬), নামাজতত্ত্ব (১৮৯৮), হজবিধি (১৯০৩), ইসলামের ইতিবৃত্ত (২খণ্ড, ১৯১০), নামাজ শিক্ষা (১৯১৭), খোতবা (১৯৩২) প্রভৃতি। এছাড়া তাঁর রোমান্সমূলক দুটি গ্রন্থ হলো আলহামরা (১৮৯১) ও প্রণয়যাত্রী (১৮৯২)। ১৯৩১ সালের ১৪ জুলাই স্বগ্রামে তিনি ইন্তিকাল করেন। দ্র. *বাংলাপিডিয়া*, খোন্দকার সিরাজুল হক 'রহিম, শেখ আবদুর'

১৯ মোহাম্মদ আকরম খাঁ একজন সাংবাদিক ও রাজনীতিক, ইসলামিশাস্ত্রজ্ঞ। তিনি পশ্চিমবঙ্গের চবিবশ পরগনা জেলার হাকিমপুর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা তেমন ছিল না। কিন্তু জ্ঞানানুসন্ধানী আকরম খাঁ ইসলাম ধর্ম এবং বাংলা ও ভারতের মুসলিমগণের ইতিহাস ও সংস্কৃতি সম্পর্কে গভীর জ্ঞান অর্জন করেন। তিনি ইসলামের বিভিন্ন বিষয়ে অনেক গ্রন্থ রচনা করেন। উল্লেখযোগ্য গ্রন্থের মধ্যে রয়েছে- সমস্যা ও সমাধান, মোস্তফা চরিত, মোসলেম বাংলার সামাজিক ইতিহাস, আমপারার বঙ্গানুবাদ। তিনি ১৯৬৯ সালের ১৮ আগস্ট ইন্তিকাল করেন। দ্র. *বাংলাপিডিয়া*, রানা রাজ্জাক, 'খাঁ, মোহাম্মদ আকরম'

২০ পূর্বোক্ত।

২১ আব্দুল খালেক, *সাইয়েদুল মুরসালিন* (ঢাকা: আহমদ পাবলিশিং হাউস, ১৯৫১ খ্রি.), পৃ. অবতরণিকা।

২২ পূর্বোক্ত।

২৩ পূর্বোক্ত।

২৪ জীবনী গ্রন্থ তিনটি এই, ক. আব্দুর রহিম, হযরত মুহাম্মদ (সা)-এর জীবন চরিত ও ধর্ম্মনীতি (১৯৮৭ খ্রি.), খ. আকরম খাঁ, মোস্তফা চরিত, (১৯৩২ খ্রি.) ও গ. গোলাম মোস্তফা, বিশ্বনবী, (১৯৪২ খ্রি.)।

২৫ আহমদ, *সাহিত্যে গোলম মোস্তফা*, পৃ. ৭১

২৬ গোলম মোস্তফা, *বিশ্বনবী*, পৃ. ভূমিকা।

২৭ সৈয়দ আলী আহসান, *মহানবি* (ঢাকা: আহমদ পাবলিশিং হাউস, ১৯৯৪ খ্রি.), পৃ. ভূমিকা।

২৮ গোলাম মোস্তফা, *বিশ্বনবি*, পরিশিষ্ট।

২৯ অধ্যাপক হাসান আব্দুল কাউম, *ঐতিহ্য*, জুলাই-ডিসেম্বর ১২বর্ষ ৭-১২ সংখ্যা, ঢাকা, ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ১৯৯৭ খ্রি., পৃ. ৮৩

৩০ *প্রেক্ষণ*, পৃ. ৮৭

৩১ জিল্লুর রহমান সিদ্দিকী, *আজাদ মুক্ত প্রাণ*, পৃ. ১৭২
৩২ গোলাম মোস্তফা, বিশ্বনবি, পরিচ্ছেদঃ ১. আমিনার কোলে, পৃ. ১৯
৩৩ পূর্বোক্ত, পরিচ্ছেদঃ ৫১, মুতা-অভিযান, পৃ. ৩১৭
৩৪ অধ্যাপক হাসান আব্দুল কাউম, গোলাম মোস্তফার চিন্তাধারা, *ঐতিহ্য*, পৃ. ৭৩
৩৫ গোলাম মোস্তফা, বিশ্বনবি, পরিচ্ছেদঃ আমিনার কোলে, পৃ. ১৯-২০
৩৬ *বিশ্বনবি*, পরিচ্ছেদঃ ৩, প্রতিশ্রুত পয়গম্বর, পৃ. ২৬
৩৭ পূর্বোক্ত।
৩৮ দিঘা-নিকায়া বৌদ্ধদিগের প্রামাণ্য গ্রন্থ
৩৯ *বিশ্বনবি*, পরিচ্ছেদঃ ৩, প্রতিশ্রুত পয়গম্বর, পৃ. ২৭
৪০ পার্শী জাতির ধর্মগ্রন্থের নাম 'জিন্দাবেস্তা' ও 'দসাতির'
৪১ Zcnd Avcsta part 1.Translated by Max Mullcr, p. 260
৪২ *বিশ্বনবি*, পরিচ্ছেদঃ ৩, প্রতিশ্রুত পয়গম্বর, পৃ. ২৯
৪৩ পূর্বোক্ত।
৪৪ Duet, 15 : 18
৪৫ *বিশ্বনবি*, পরিচ্ছেদঃ ৩, প্রতিশ্রুত পয়গম্বর, পৃ. ৩০
৪৬ John. Chap.14:15-16
৪৭ *বিশ্বনবি*, পরিচ্ছেদঃ ৩, প্রতিশ্রুত পয়গম্বর, পৃ. ৩০
৪৮ আল-কুর'আন, ৩ : ৮০
৪৯ *বিশ্বনবি*, পরিচ্ছেদঃ ৩; প্রতিশ্রুত পয়গম্বর, পৃ. ৩০
৫০ পূর্বোক্ত।
৫১ পূর্বোক্ত।
৫২ পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৪
৫৩ পূর্বোক্ত, পৃ. ৫৮
৫৪ পূর্বোক্ত, পরিচ্ছেদঃ ৯, বক্ষ বিদারণ, পৃ. ৬০
৫৫ পূর্বোক্ত।
৫৬ পূর্বোক্ত।
৫৭ গোলাম মোস্তফা, *বিশ্বনবি*, পৃ. ৩৬৭
৫৮ পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৬৮
৫৯ পূর্বোক্ত।
৬০ পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৬৯
৬১ আহমদ মোস্তফা, পৃ. ৭৯
৬২ গোলাম মোস্তফা, *বিশ্বনবি*, পৃ. ৪৮৯
৬৩ পূর্বোক্ত।
৬৪ পূর্বোক্ত।
৬৫ পূর্বোক্ত, পৃ. ৪৭৮

৬৬ পূর্বোক্ত।

৬৭ দেওয়ান মোহাম্মাদ আজরফ, কবি গোলাম মোস্তফা, *ঐতিহ্য*, পৃ. ১১-১২

৬৮ *বিশ্বনবি*, পৃ. ৪৭২

৬৯ পূর্বোক্ত।

৭০ পূর্বোক্ত, পৃ. ৬২